আলোর পাহাড়

উৎসর্গ-পত্র

স্নেহ ও করুণার প্রতিমূর্ত্তি

কল্যাণী

অনুজা শ্রীমতী স্নেহপ্রভা দেবীর

কর-কমলে

এই বইখানি

সাদরে

অর্পণ করলাম

রামমোহন রায় রোড,
কলিকাতা
ফাল্গুন ১৩৩৫

রবীন্দ্রনাথ সেন

দু'টি কথা

'আলোর পাহাড়' গল্পটি জগতের সৌন্দর্য্যকলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাবুক রাস্কিনের রচিত একটি গল্পের ছায়ানুসরণে লিখিত। মহামতি রাস্কিন যে শিক্ষার উদ্দেশ্যে শিশুদের উপযোগী এই গল্পটি রচনা করেন, সেটিকে আমি যথাসম্ভব নূতন আকারে পরিবর্ত্তিত করে' দেশোপযোগী করতে চেষ্টা করেছি ;—সেজন্য গল্পের উপাখ্যানভাগ মোটামোটি স্বতন্ত্র হোলেও শিক্ষার উদ্দেশ্যটি এতে সম্পূর্ণই অটুট আছে।

জগতের সর্ব্বজীবের কল্যাণ-সাধনই বর্ত্তমান গল্পটির মূল সূত্র। ভারতীয় ঋষিগণের জীবনযাত্রার নির্দ্দিষ্ট পথটিও ছিল তাই ;—তজ্জন্য শাস্ত্রোক্ত পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান

আর্য্য-মাত্রেরই দৈনন্দিন কর্ম্ম ছিল। খেচর, ভূচর, অন্তরীক্ষ-বাসী, বিদেহী আত্মা—কায়মনবাক্যে প্রত্যেকেরই কল্যাণ কামনা করিয়া তাঁহারা নিত্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন। বিশ্বের যাবতীয় বস্তু ও প্রাণীমাত্রেই আত্মবোধের হেতু বিদ্যমান, তজ্জন্য সমগ্র বিশ্ব-জগৎই তাঁহাদের আপনার ছিল। কূপমণ্ডুকবৎ গণ্ডির ভিতর নিজেদের স্বতন্ত্ররাখার ইচ্ছা আর্য্যঋষিগণের মনে কখনো স্থান পায় নাই।

মানুষ যেদিন জগতের প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে একাত্ম ভ্রাতৃভাব অনুভব করবে—সেদিনই সে, বুদ্ধ, ঈশা, মহম্মদ, চৈতন্য—জগতের প্রত্যেক মহাপুরুষের বাণীর যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবে।

'তিনকড়ির ডায়েরী' গল্পে রুণুর শৈশবের ছড়াটি আছে: আর আছে বীণা, শৈল ও তরুণের স্নেহাভিষিক্ত বাল্য-স্মৃতি;—বড় হয়ে যখন তারা এই গল্প পড়বে, অতীত স্মৃতির নিরালা দিনগুলি আমার ভরে উঠ্‌বে তাদের স্নেহের কথা স্মরণ করে'।

কলিকাতা
১৮ই মে, ১৯২৯

রবীন্দ্রনাথ সেন

অনুক্রম

আলোর পাহাড়

এক

সারি সারি অনেকগুলি পাহাড় এক জায়গায় জড়ো ক'রে মস্ত বড় হিমালয় পাহাড়টি তৈরী হয়েছে। ভগবানের এই সোজা কাজটি যে জগতের পক্ষে একটা বড় রকমের বে-দরকারী জিনিষ, এমন কথা কেউ কেউ ব'লে থাকেন। কেননা, সেখানে লোকের চলাফেরার কষ্ট যেমন প্রচুর, শুষ্ক পাথরের ঢিপি বা স্তূপগুলিও তেম্নি অকেজো ;—কাজেই জগতের সমৃদ্ধির হিসাবে এগুলিকে একেবারেই নিরর্থক বলা চলে। কিন্তু যদি তাঁরা দয়া ক'রে শিলিগুড়ি থেকে ছোট্ট গাড়ীতে চেপে দার্জ্জিলিং এসে পৌছান, তবে তাঁদের বল্‌তেই হবে, পাহাড়স্তূপের এই বেদরকারী জিনিষের ভিতরও

ভগবান এমন একটা অসামান্য সৌন্দর্য্য ছড়িয়ে রেখেছেন, যা' পৃথিবীর অন্যত্র পাওয়া সম্ভব নয়। সেই প্রাকৃতিক

হিমালয়ের অচল তুষারমালা

শোভা যে কি মনোহারিণী—নিজের চোখে না দেখ্‌লে তা বর্ণনা ক'রে বোঝানো সম্পূর্ণ অসম্ভব।

এখানে এসে যে দিকে তাকাও, মনে হবে, বিমান-প্রবাসী মেঘমালার আশ্রয়ের জন্যই বুঝি এই পাহাড়শ্রেণী দিকে দিকে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। এই হাল্কা নরম

মেঘগুলি যখন কুণ্ডলী পাকিয়ে পাহাড়ের গা জড়িয়ে থাকে, মনে হয়, মেঘপরীরা বুঝি খেলা করতে এসে এখানেই ঘুমিয়ে পড়েছে। কখনো কখনো বনের গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে মেঘগুলির বার বার আনাগোনা দেখে মনে হয়, যেন এরা লুকোচুরি খেলছে!

দার্জ্জিলিঙের সিঞ্চল কিম্বা 'টাইগার হিলে' বেড়াতে গেলে দেখা যায়, চারিদিকের এই সারি সারি পর্ব্বতশ্রেণী কি আশ্চর্য্য রকমে কে যেন সাজিয়ে রেখেছে! আকাশ-পটে সেগুলি যেন বিধাতার খাস্ দরবারের ছবি! সেই ছবিব ঔজ্জ্বল্য, ভাব ও সৌন্দর্য্য প্রতি মুহূর্ত্তেই বদল হয়।

ভোরের বেলা সূর্য্য যখন জোড়া পাহাড়ের ভিতর থেকে সোনার ঝর্ণায় সাঁতার কেটে আকাশ পথে উড়তে সুরু করে, পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় তখন নানারঙেব ঝালর কে যেন ঝুলিয়ে দেয়! বহুদূরে পাহাড়ের বুকে রঙিত ও তিস্তা নদী টুক্‌টুকে হাসিটির মতো লাল হয়ে উঠে! এই দৃশ্য দেখে বিস্ময়ে লোক অবাক হয়। সেজন্য অনেকেই সিঞ্চল কি 'টাইগার হিলে' বেড়াতে আসেন। বিশেষতঃ এই পাহাড়ের চূড়া থেকে কাঞ্চনঝঙ্ঘা ও গৌরীশঙ্করের শৃঙ্গ দু'টি বেশ স্পষ্ট

নজরে পড়ে। সেজন্য কেউ কেউ এই পাহাড়ের নাম রেখেছেন, আলোর পাহাড়।

কাঞ্চনঝঙ্ঘার দৃশ্য

এই পাহাড়ের তলায় যেখানে তিস্তা এবং রঙিত এসে মিশেছে, তার ঠিক বাঁকের মুখে বহুকাল পূর্ব্বে একটি চমৎকার বাগান ছিল। সেখানে নানারকম তরি-তরকারী এবং বহুবিধ সুস্বাদু ফলের গাছ ছিল। এই সকল গাছে এত

প্রচুর ফল জন্মাতো যে, হাটে বাজারে বিক্রি ক'রে যথেষ্ট টাকাকড়ি মালিকের তাতে উপার্জ্জন হতো।

তিন ভাই ছিল এই বাগানের মালিক। বড় ভাই
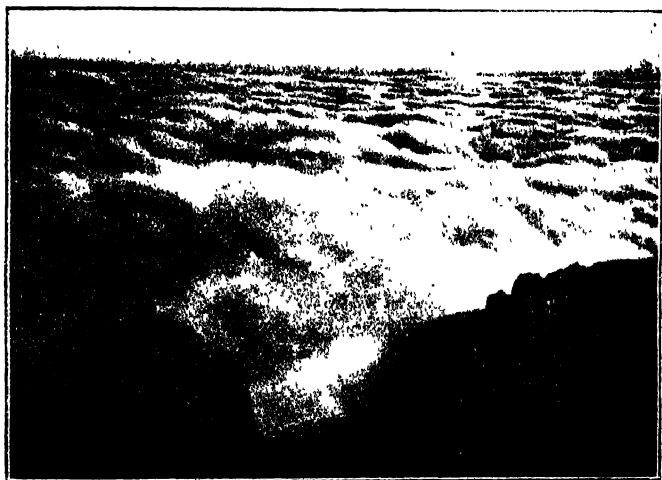
হিমালয়ের চূড়ায় মেঘ-সমুদ্র

দু'টির চেহারা এবং স্বভাবে এতটা মিল ছিল যে সকলে তাদের বিদ্রূপ ক'রে ডাক্‌তো—জোড়া মাণিক। কেবল ছোট ভাইটির চেহারা এবং স্বভাব ছিল ঠিক তাদের উল্টো।

বড় ভাইটির নাম রামলাল, মেজটির নাম হীরালাল এবং ছোটটির নাম সাধুলাল।

বড় এবং মেজোর গায়ের রঙ ছিল উনুন-পোড়া টোলা পাতিলের মতো মিশ্‌মিশে কালো; গোফ্‌ জোড়া কাবলী বেড়ালের লেজের মতোই ফুলো; এবং দাঁতগুলি ছিল ঠিক যেন বোম্বাই মুলো! তা ছাড়া, শরীরের হাত পাগুলি উটের পায়ের মতই টিক্‌টিকে লম্বা; গায়ের চামড়া গরুর জিভের মতই খস্‌খসে এবং গণ্ডারের চামড়ার মতই ভাঁজ-কাটা ও পুরু। এদের স্বভাবটাও ছিল বড়ই মন্দ,—কথায় কথায় গালমন্দ এবং কুকথা সর্ব্বদাই পেটে ঠাসা থাক্‌তো। একটু কিছুতেই তারা চটে লোককে চাটি মারতে প্রস্তুত ছিল। এজন্য আশপাশের কেউ তাদের সঙ্গে দেখা করতে কিম্বা কেউ আত্মীয়তা রক্ষা করতেও চাইতো না। তারা বাগানের ফলমূল বিক্রি ক'রে ফেলে ঘোড়া মহিষের মাংস বাজার থেকে কিনে খেত; সেজন্য তাদের রাগ ও গোয়ার্ত্তুমির সঙ্গে নির্ব্বুদ্ধিভাব পরিমানটা ঘোড়া মহিষকেও ছাড়িয়ে উঠেছিল।

প্রয়োজনের বাইরে কোন জিনিষেই তারা হাত দিত না,

এবং নিজের ব্যবহারে না লাগলে সেটা নষ্ট ক'রে ফেল্‌তে তারা একটুও গররাজি ছিল না। গাছের ফল ঠোক্‌রায় ব'লে তারা তীরধনুক দিয়ে চারিদিকের পাখীগুলি মেরে ফেল্‌ল। দুধ দেওয়া বন্ধ হোলে গরুগুলিকে কসাইয়ের কাছে বিক্রি ক'রে দিত। টিক্‌টিকি বাড়ীর দেয়ালে কি উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়ায় এই সন্দেহে চারিদিকের সমস্ত টিক্‌টিকি মেরে ফেল্‌ল। ইঁদুরের গর্ত্তের মুখে মাংসের হাড় পাওয়া গেল, কাজেই চারিদিকের যত গর্ত্ত পাথর দিয়ে সব বুজিয়ে দিল। বাগানের কোণে মাকড়শার জাল দেখ্‌তে পেলে ভাই দুটি তাড়াতাড়ি তাতে আগুন ধরিয়ে দিত। এই ভাবেই তারা নিজেদের বাগানের ফসল রক্ষা করতো। কোন্‌ গাছে কত ফল ধরছে, গুণে তার হিসাব ঠিক রাখতো; কাজেই কোনক্রমে একটি ফল চুরি গেলে কিম্বা পাখীতে ঠোক্‌রাইলে দুই ভাই সারারাত্রি জেগে পাহারা দিত। এক কানাকড়িও তারা ভুলে কাউকে ছেড়ে দিত না, বরং দাও মেরে পরের টাকা কড়ি কিছু ট্যাঁকে গুঁজতে পারলে তাতে একটুও কসুর করতো না। চাকর-বাকর সারা বছর গতর খাটিয়ে শেষটায় উপরন্তু গলাধাক্কা কি পায়-পয়জার খেয়ে

বিদায় হতো। মন্দা বাজারে ধান চাউল মজুত ক'রে আক্রার দিনে সেগুলি বিক্রি ক'রে ভাই তুইটি মোটা পয়সা ঘরে আনতো। এই রকম ঠকামি ও ভদ্রজুয়ারীর ব্যবসা ফেঁদে যথেষ্ট টাকাকড়ির তারা মালিক হয়েছিল। কিন্তু ছোট ভাই সাধুলাল ছিল ভারি সোজা ও সরল প্রকৃতির লোক। বছর বারো বয়স; জাল জুয়াচুরির মোটেই সে ধার ধারতো না। চোখ তুটি তার কালো—পদ্মদীঘির জলের মতই স্বচ্ছ, এবং মনটিও ছিল স্নেহ মমতায় ভরা। বড় ভাই তুটিকে সে বাঘের মতই ভয় করতো। ভাইদের সঙ্গে তার যেমন কোন-কিছুরই মিল ছিল না, তেমনি ভাইরাও তার সঙ্গে মোটেই মিলেমিশে থাকতে পারতো না। ভাইরা সকল কাজেই তাকে খুব খাটিয়ে নিত, এবং নিজেদের ব্যবহারটা ভাইয়ের বেলা যে একটুও মোলায়েম ছিল, এমন বলা যায় না। কেননা, কাজের একটু ভুলচুক হ'লেই ছোট ভাইয়ের পিঠে তাদের ঘুসির বহরটা নিতান্ত ছোট ব'লে মনে হতো না।

এই ভাবে অনেক দিন কাটলো। সেবার ভারি বর্ষা সুরু হোল। সেই বাদলায় লোকের বাড়িঘর জায়গাজমি

সব তলিয়ে গেল,—কারু ঘরে এক তিল খাবার রইলো না। ভারি দুর্ব্বৎসর। কিন্তু রামলাল ও হীরালালের গোলায় প্রচুর ধান মজুত। তাতে ভাই দুটির তো খুসীর সীমা নাই। দলে দলে লোক তাদেব কাছে শস্য কিনতে এলো। ভাই দুটিতো নিজেদের খুসী মত দাম হেঁকে চুপ ক'রে থাকে। খুসী নেও—নইলে সোজা পথ দেখ, এই তাদের ভাব। নেহাৎ গরিব ছাড়া সকলেই কিছু কিছু ক্রয় করলো, কিন্তু শাপমন্নি দিল বিস্তর। বিস্তর লাভ পেয়ে ভাইরা এ সব কথায় মোটেই কান দিল না। গরিবরা না খেতে পেয়ে দরজায় মাথা খুঁড়ে মরতে লাগলো—এতেও তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই।

দুই

শীতকাল এসে পড়লো। বেজায় ঠাণ্ডা বাতাস বইতে সুরু হয়েছে। একটা আস্ত মোষ আগুনের তাতে চড়িয়ে সাধুর হাতে সেটা তৈরীর ভার দিয়ে বড় ভাই দু'টি কোথাও বেড়াতে গেছে। বাইরে প্রবল বৃষ্টির ছাট্ এসে দরজায় লেগে শব্দ হচ্ছে।

সাধু ঘরে বসে ভাব্‌ছে, এমন একটা আস্ত মোষ—দু' পাঁচজনকে যে খেতে বল্‌বে তাও নয়! এমন দিনে পাঁচ জনে একত্র বসে খেতে যে কি সুখ—তাও জীবনে ঘট্‌লো না।

ঘরের দরজায় অম্‌নি বার কতক জোরে আওয়াজ হোল; কিন্তু সেটা বাতাসের কি মানুষের শব্দ কিছুই বোঝা গেল না। হয়তো বাতাসেরই শব্দ—নইলে এমন জোরে আমাদের দরজায় ঘা দিতে কারুর সাহসে কুলাবে না।—সাধু এই ভেবে চুপ ক'রে রইলো।

আবার সেই জোরে ধাক্কা। সাধু ভাব্‌লো, হয়তো
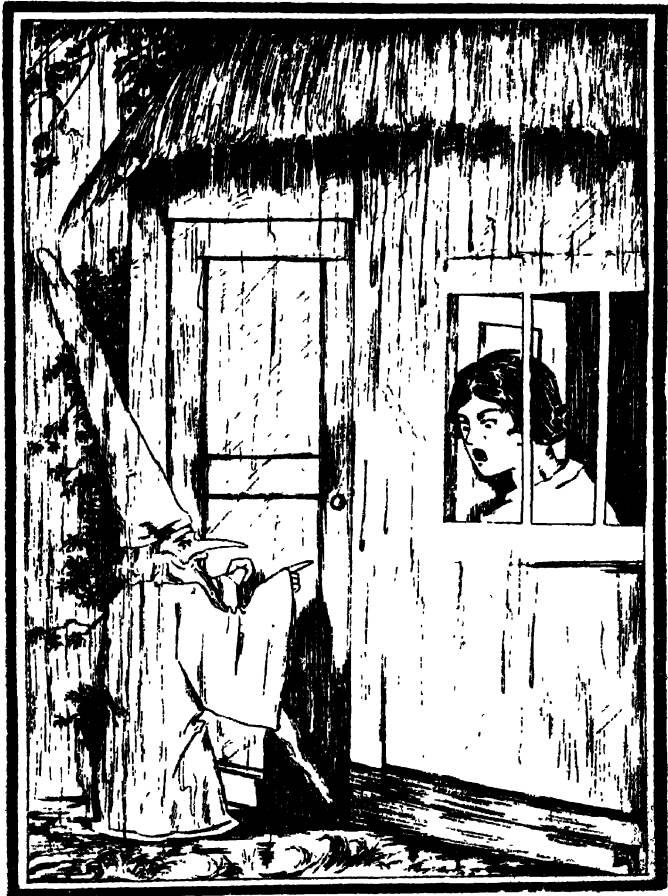
সাধু পাশের জানালা খুলে চুপি দিয়ে দেখতে পেল

কোন জরুরি খবর, নইলে এমন বেকুব কেউ নেই যে এখানে এসে দরজা ঠেল্‌বে।

সাধু পাশের জানালাটা খুলে চুপি দিয়ে দেখ্‌তে পেল, ভারি অদ্ভুত রকমের এক বুড়ো বেঁটে রকমের লোক দরজায় দাঁড়ানো। নাকটি তার জিরাফের গলার ন্যায় লম্বা, গায়ের রং দেয়ালের সেওলার মতই ঘন সবুজ, গালে তিন হাত লম্বা দাড়ি—কাপাসের মতো ধবধবে সাদা। ঠোঁটের উপর এক জোড়া গোঁফ মোষের শিংয়ের মতই দুধারে বাঁকিয়ে রয়েছে। লোকটির মাথায় বাবাজি-ধরণের তিন হাত উঁচু একটা টুপি—রথের চূড়ার মতই উপরে সরু হয়ে উঠেছে। লোকটির গায়ে এম্‌নি ঢোলা একটা মেরজাই যে তাতে হাতের আঙ্গুল থেকে পায়ের গোড়ালি অবধি ঢাকা পড়েছে।

এই চেহারা দেখেই তো সাধুর আক্কেল গুড়ুম! সেই লোকটি ঢোলা জামার হাতলের ভিতর থেকে অতি কষ্টে হাত দু'খানা বের ক'রে পুনরায় দরজায় ধাক্কা দেবার উদ্যোগ করতেই চেয়ে দেখ্‌লো, জানালার গরাদের ফাঁকে একখানা মস্ত বড় হাঁ যেন আটকা পড়েছে এবং চোখের মণিদু'টির

যেন ভিতরে উল্টে পড়বার জন্য বেজায় রকমের টানা হেঁচড়া চল্‌ছে।

বৃদ্ধটি সেদিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে বল্‌ল,—ওহে, চোখ দিয়েই দরজার চাবি ঘোরাচ্ছ নাকি? এই ভাবে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌বো? একেবারে বেড়ালভেজা গোছের হয়ে উঠেছি যে!

বাস্তবিক লোকটির সর্ব্বাঙ্গ ভিজে দাড়ি বেয়ে জলের স্রোত গড়িয়ে পড়ছিল।

সাধু উত্তর দিল,—মাপ করুন, সেটি হবে না মশায়।

বৃদ্ধ উত্তর দিল,—কোনটি হবে না?

সাধু উত্তর দিল,—এখানে ঠাঁই হবে না; তা' হ'লে ভাইরা আমাকে মেরে খুন করে ফেল্‌বে।

বৃদ্ধ জবাব দিল,—কি বল্লে?—ঠাঁই হবে না। অত বড় ঘরখানায় একটু ঠাঁই হবে না—একেবারে অসম্ভব কথা বল্‌চো যে! বাইরে দাঁড়িয়ে বুড়ো মানুষ মারা যাই—এই তোমার ইচ্ছে? ঘরেতো দিব্যি আগুন জ্বেলে রেখেছ দেখ্‌তে পাচ্ছি—সেখানে দাঁড়িয়ে একটু গরম হ'বো বই তো নয়! ভাইরা এলে সে জবাব বরং আমিই দেবো।

জানালা দিয়ে বাইরের কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে সাধুর গায়ে লাগ্‌ছিল। ঘরের উজ্জ্বল আলোকের দিকে তাকিয়ে সে ভাব্‌লো, বেচারা উনুনের ধারে দাঁড়িয়ে একটু গরম হ'লে কি-ই বা ক্ষতি ?

সাধু ঘরের দরজা খুলে দিয়ে বল্‌ল,—দোহাই তোমার, আমার ভাইদের সঙ্গে তোমার কথা ব'লে কাজ নেই,—তাঁদের আস্‌বার আগেই বরং তুমি চলে যেও।

বৃদ্ধ উত্তর দিল,—বটে ! তা' ওরা ফিরবে কখন ?

সাধু বল্‌ল,—এই মাংসটা হ'য়ে গেলেই তাঁরা ফিরে আস্‌বে।

লোকটি তখন ধীরে ধীরে এসে উনুনের ধারে বস্‌লো তার মাথার টুপিটা এত লম্বা যে সেটা ঘরের চালে গিয়ে ঠেকেছে।

"এখানে একটু বস্‌তেই তোমার সব শুকিয়ে যাবে"—ব'লেই সাধু পুনরায় মাংসটা নেড়েচেড়ে দেখতে লাগ্‌লো। একটু বাদেই সে চেয়ে দেখ্‌লো,—সেই লোকটির শরীর না শুকিয়ে বরং ফোঁটা ফোঁটা আরো জল পোষাকের ভাঁজে নীচে গড়িয়ে পড়ছে। তা' ছাড়া লোকটার দাড়িতে যেন

লোকটার দাড়িতে যেন একটা ঝর্ণা লেগেই আছে।

একটা ঝর্ণা লেগেই আছে! সেই জলের ছাটে উনুনের অর্দ্ধেক আগুন কালো হয়ে উঠেছে। সেই জলের স্রোত ক্রমে মেঝের উপর গড়িয়ে যেতে দেখে সাধু বল্‌ল,—দয়া ক'রে আপনার পোষাকটা খুলে রাখ্‌বেন কি?

বৃদ্ধ উত্তর দিল,—না, এই বেশ আছি।

"ত' হ'লে দয়া ক'রে আপনার ঐ লম্বা টুপিটা যদি খুলে রাখেন"—সাধু ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌ল।

'না, এই বেশ আছি'—ব'লে বৃদ্ধ আরো জাকিয়ে বস্‌লো।

সাধু ব্যস্ত হয়ে বল্‌ল,—কিন্তু মশায়, আমার উনুনটা যে একেবারে নিভিয়ে দিলেন।

"বেশ তো, বরং মাংসটা তৈরী হ'তে ঢের দেরী হ'বে"—ব'লেই বৃদ্ধ নিজের পাকা দাড়িতে ঘন ঘন হাত বুলাতে লাগ্‌লো।

সাধু মহা ফাঁপড়ে পড়লো। কিছুক্ষণ সে চুপ ক'রে রইলো।

এইবার বৃদ্ধ আস্তে আস্তে বল্‌ল,—ওহে, তোমার মাংসটা বেশ হয়ে এসেছে দেখছি; আমায় এক টুক্‌রো দিতে পার?

সাধু উত্তর দিল,—অসম্ভব।

বৃদ্ধ বল্‌তে লাগলো,—অসম্ভবটা কিসে? আমি ক্ষিদের জ্বালায় মারা যাই, এই তোমার ইচ্ছে? দু' দিন কিছুই খেতে পাই নি যে।

এই কথায় সাধুরও মন গলে গেল; সে উত্তর করলো,—আচ্ছা, আমার ভাগের টুক্‌রো থেকেই খানিকটা তোমায় দিচ্ছি;—তারপর যা' কপালে থাকে হবে।

"বেশ ছেলে তো তুমি"—বল্‌তেই বৃদ্ধের গোঁফের তলে একটু মুচ্‌কি হাসির রেখা ফুটে উঠলো।

সাধু একখানা থালায় এক টুক্‌রো গরম গরম মাংস কেটে দেবার উদ্যোগ করতেই সদর দরজায় ঘন ঘন কড়া নাড়া সুরু হোল। সাধু তাড়াতাড়ি কাটা টুক্‌রোখানা মাংসের সঙ্গে জুড়ে দরজা খুলে দিতে গেল।

রামলাল ঘরে ঢুকেই ভিজে ছাতাটা সাধুর গায়ের উপর ছুড়ে দিয়ে বল্‌ল,—কি কচ্ছিলে হতভাগা?—দরজায় দাঁড়িয়ে এতক্ষণ ভিজছি সেটা খেয়াল নেই?

হীরালাল একটা ছোট্ট খাটো ঘুসি সাধুর নাকের উপর ঝেড়ে সোজা রান্না ঘরে এসে হাজির হোল।

বৃদ্ধ তখন ঘরের ঠিক মধ্যস্থলে সোজা দাঁড়িয়ে আছে।

হীরালাল সাধুর দিকে ফিরে মুখ ভেংচে বল্‌লো,—ওটি কে?

সাধু ভয়ে ভয়ে জবাব দিল,—একজন পথিক।

হীরালাল বল্‌ল,—কিন্তু ঘরের ভিতর ঢুক্‌লো কি ক'রে?

সাধু উত্তর করলো,—বৃষ্টিতে ভিজে লোকটির ভারি কষ্ট হচ্ছিল।

হীরালাল অম্নি হাতুড়ীটা তুলে সাধুর মাথায় ছুড়ে মারতে গেল। বৃদ্ধ নিজের টুপিটা তার সাম্‌নে এগিয়ে ধরতেই একগাছা খড়ের মতো ছিট্‌কে হাতুড়ীটা ঘরের এক কোণে গিয়ে পড়লো।

হীরালাল বৃদ্ধের দিকে কট্‌মট ক'রে তাকিয়ে বল্‌ল,—কে তুই? বেরো ঘর থেকে।

রামলাল রেগে চেঁচিয়ে বল্‌ল,—কি কোত্তে ঘরে ঢুকেছিস্? বেটা বেল্লিক!

বৃদ্ধ শান্তভাবে জবাব দিল,—জানালা দিয়ে ঘরের ভিতর আগুন দেখতে পেয়ে একটু গরম হবো ব'লে এসেছিলুম।

বেড়ালের মতো গোঁফ ফুলিয়ে রামলাল বললো—আলবৎ

"এখন ভালয় ভালয় সরে পড়, নৈলে শরীরের হাড় ক'খানা এখানেই খুইয়ে যেতে হবে" ব'লেই হীরালাল দুই হাতের আস্তিন গোটাতে সুরু করলো।

বৃদ্ধ বল্‌ল,—এই দুর্দ্দিনে এমন বুড়ো মানুষকে তোমরা মেরে তাড়িয়ে দিবে?

বেড়ালের মতো গোঁফ দুলিয়ে রামলাল বল্‌ল,—আলবৎ। এটা তোমার শ্বশুর বাড়ী পেয়েছ কিনা, খেয়ে দেয়ে আরাম করবে।

বৃদ্ধ বল্‌ল,—ক্ষিদেয় বড্ড কষ্ট পাচ্ছি: খানিকটা রুটি পেলেই আমি চলে যাই।

রামলাল রেগে বল্‌ল,—রুটি? আমার আদুরে গোপাল রে—। গায়ে তো মস্ত একটা জামা জড়িয়ে এসেছ, ওটা বেচে ফেল্লেই তো পার।

বৃদ্ধ হাত জোড় ক'রে বল্‌ল,—এক টুকরো রুটি বই তো নয়!

"রুটি—না, চাটি?" ব'লেই ঘুসি বাগিয়ে হীরালাল বৃদ্ধের কাছে গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লাটিমের মতো নিজেই ঘুরে তিন পলট্ খেয়ে দেয়ালের গায়ে গিয়ে উল্টে পড়লো।

পুনরায় ঘুসি বাগিয়ে মারতে এসেই সে ধাক্কা খেয়ে রাম লালের ঘাড়ের উপর উল্‌টে পড়লো।

তারপর সেই বৃদ্ধ ঢোলা মেরজাইটা তাড়াতাড়ি গায়ে জড়িয়ে ফেলে টুপিটা মাথায় তুলে দিতেই নিজের লম্বা দাড়িগুলি নৌকোর পালের মত হাওয়ায় যেন উড়ে চল্‌ল। তারপর গোঁফ জোড়ায় বার কতক মোচড় দিতেই চোখ দুটা যেন বিদ্যুতেরই মতো ঝল্‌সে উঠলো। ভাই দু'টির দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধ বল্‌ল,—রাত বারোটায় পুনরায় দেখা হবে, মনে রেখো।

হীরালাল ভুঁয়ে থেকেই ঘুসি বাগিয়ে বল্‌ল,—আবার দেখা পেলেই হয়, তখন বোঝা পড়া হবে! দেখ্‌বো কত বড় পা—কথাটা শেষ হবার পূর্ব্বেই বৃদ্ধ এমন জোরে বেরুয়ে গেল যে ঘরের মেজে অবধি ঠক্ ঠক্ ক'রে কেঁপে উঠলো।

সেই রাত্রি বারোটায় ভীষণ ঝড়বৃষ্টি শুরু হ'তেই রাম-লাল ও হীরালাল লেপ মুড়ি দিয়ে বিছানায় পড়ে রইলো।

উনুনের এক পাশে সাধু শুয়ে ছিল ; ঝড় ঝাপ্‌টায় ঘরের হুড়কো ভেঙ্গে দরজা খুলে যেতেই বিদ্যুতের আলোয় ঘরের ভিতরটা ফর্সা হয়ে উঠলো।

সাধু চেয়ে দেখলো, ঘরের মাঝখানে সেই বুড়ো সটান দাঁড়িয়ে দাড়ি নাড়ছে ;—পোষাকটা তার বিদ্যুতের মতই ঝক্ ঝক্ কচ্ছে।

সাধু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলো,—এই অসময়ে আবার এসে হাজির হ'লে কেন ?

বৃদ্ধ উত্তর দিল,—রাত বারোটায় আস্‌বো ব'লে গিয়েছিলুম। তুমি এই মাচার উপর উঠে শুয়ে থাকো। আমার সঙ্গীরা এখুনি এসে পড়বে।

সাধু জিজ্ঞাসা করলো—তোমার সঙ্গীরা কে কে ?

বৃদ্ধ উত্তর দিল,—ঝড়, শিলাবৃষ্টি ও বিদ্যুৎ।

সাধু পুনরায় প্রশ্ন করলো,—তবে তোমার নামটি কি ?

বৃদ্ধ উত্তর দিল,—পূবো হাওয়া।

চারিদিকে মেঘের গর্জ্জন ও বজ্রের কড় মড় শব্দে কানে তালা লাগ্‌বার উপক্রম হোল ; সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধকেও আর দেখা গেল না। এমন জোরে ঘরের ভিতর জল গড়িয়ে পড়তে লাগ্‌লো যে অল্পক্ষণের মধ্যেই সেখানে এক হাঁটু জল দাঁড়ালো।

জল ক্রমেই বেড়ে যখন কোমর জলে পরিণত হোল

তখন রামলাল ও হীরালাল বিছানা ছেড়ে ধড়ফড়িয়ে উঠে পড়লো। জলের স্রোতে ঘরের বিছানাপত্র তক্তপোষ চেয়ার টেবিল সমস্তই ভেসে জানালা গলিয়ে কোথায় ভেসে চল্‌ল।

ঘরের ভিতর যখন নাকের ডগা সীমানা জল দাঁড়িয়েছে ; তখন রামলাল ও হীরালাল অতিকষ্টে ঘরের কড়িকাঠ ধরে ঝুলে রইলো।

সারারাত্রি সেই পাহাড়ে ঝড়ো হাওয়ার এই রকম অত্যাচার চল্‌তে লাগ্‌লো ; সঙ্গে সঙ্গে শিলাবৃষ্টি এবং বজ্রপাতের বিরাম ছিল না। পাহাড়ের বড় বড় গুহা ভেঙ্গে পাগ্‌লা হাতীর মত সেই জলের স্রোত সমস্ত ভাসিয়ে নিয়ে চল্‌ল।

তিন

পরদিন সকাল বেলা ঝড় বৃষ্টি থাম্‌লে রামলাল ও হীরালাল বাইরে এসে দেখলো, কাল্‌কের জলের স্রোতে পাহাড়ের একটা দিক ধসে যাওয়ায় তাদের বাগানের চিহ্ন মাত্রও নাই ;—সেখানে কেবল বড় বড় পাথরের ঢেলা এবং গাছপালার স্তূপ চারিদিক থেকে এসে জড়ো হয়েছে।

সাধু ঘরের ভিতর অনুসন্ধান ক'রে দেখ্‌লো, রান্নার জিনিষ কি তৈজসপত্র কিছুই ঘরে নেই, কেবল ঘরের এক কোণে বহু পুরাণো রূপোর একটা পিক্‌দানী পড়ে আছে। সাধু সেইটিকে তুলে ঘসে মেজে পরিষ্কার করলো। এই পিকদানীটা ছিল তার দাদা মশায়ের ; বহুদিন অব্যবহারে এখানে পড়েছিল।

সারা সকালটা ঘুরে ঘুরে রামলাল ও হীরালালের মেজাজটা মোটেই ভাল ছিল না। দুপুর বেলা দুজনে ঘরে ফিরে এসেই দেখে, সাধু পিকদানীটা হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে আছে।

রামলাল চেঁচিয়ে বল্‌ল,—খাবার কিছু তৈরী হোল ?

সাধু ভয়ে ভয়ে উত্তর দিল,—ঘরে যে আজ কিছুই নেই।

হীরা বল্‌ল,—তবে সাজের পুতুলের মতো চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছিস্ কেন ?

সাধু উত্তর দিল,—তোমরা কখন ফিরে আস্‌বে তাই ভাব্‌ছিলুম।

রামলাল বল্‌ল,—বেশ, তুই এক কাজ কর। এই পিক-দানীটা আগুনে গলিয়ে ফেল দেখিন ; দেখি, কতটা রূপো এতে পাওয়া যায় ; তাই বেচে বাজার থেকে আজ্‌কের খাবার দাবার কিনে আন্‌বো।

পাত্রটা গলিয়ে ফেল্‌বার হুকুম দিয়েই রামলাল ও হীরালাল পুনরায় বাইরে বেরুয়ে গেল।

পিকদানীটা একটা মাটির পাত্রের উপর রেখে সাধু উনুনে জ্বাল চড়িয়ে দিল। সেটা আগুনে খানিকটা গল্‌তেই তা' থেকে কেমন একটা বিশ্রি ধূয়ো বেরুতে লাগ্‌লো। তারপর সেই পাত্রের ভিতর অদ্ভুত চেহারার ছোট্ট একটি মানুষের মাথা চাগিয়ে উঠলো ; ক্রমে তার হাত পা সহ

মস্ত বড় একটা ভুঁড়ি দেখা দিল। সেই লোকটি বার কতক হাঁই তুলে হাত পা মোড়ামুড়ি দিতে লাগ্‌লো ;—এই ভাবে শরীরের শক্ত কব্জাগুলিকে যেন খানিকটা আল্গা ক'রে নিল। তারপর ঘাড়টাও সাম্‌নে পিছনে দু' চার বার বাঁকিয়ে লোকটি সাধুর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলো।

সাধু বিস্ময়ে অবাক হয়ে মূর্ত্তির হাবভাবের দিকে তাকিয়ে রইলো। প্রথমে সে এটাকে একটা চীনামাটির পুতুল ব'লেই মনে করেছিল ; কিন্তু বার কতক চোখ রগ্‌ড়ে ঝাপ্‌সা কাটিয়ে দেখ্‌লো, মূর্ত্তির চোখের তারা এবং ভুঁড়িটা নিঃশ্বাসের সঙ্গে ওঠা নামা কচ্ছে। কাজেই সাধু অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো,—কে তুমি ?

মূর্ত্তিটি আরো বার কতক হাই তুলে ভুঁড়ি দোলাতে দোলাতে উত্তর দিল,—রূপকুমার।

সাধু বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলো,—রূপকুমার ?—এখানে এলে কি ক'রে ?

মূর্ত্তিটি উত্তর দিল,—এখানেই তো বরাবর ছিলুম।

সাধু বল্ল,—কই, পূর্ব্বে কোনদিন দেখি নি' তো।

মানুষের মতো মাথা চাগিয়ে উঠলো ; ক্রমে তার হাত
পা সহ মস্ত বড় ভুঁড়ি দেখা দিল।

মূর্ত্তি বল্‌ল,—দেখেছ, কিন্তু চিন্‌তে পারো নি'।

সাধু উত্তর করলো,—আমি তো এইমাত্র পিকদানীটাই উনুনে জ্বাল দিচ্ছিলুম—গলাবো ব'লে, কিন্তু এখন গ্রহের ফেরে দেখ্‌চি তুমি!

মূর্ত্তি উত্তর দিল,—তাই তো বটে। এতদিন আমি পিকদানীই ছিলুম—সে-ও গ্রহের ফেরে, এখন হয়েছি রূপ-কুমার।

সাধু বল্‌ল,—এ তো ভারি আশ্চর্য্যের কথা! মূর্ত্তিটি সজোরে ঘাড় নেড়ে বল্‌ল,—আশ্চর্য্যের কথাই তো বটে। বহুকাল পূর্ব্বে একজন আমাকে পিকদানী ক'রে এখানে আট্‌কে রেখেছিল, আজ তা' থেকে মুক্ত হোলেম। আগুনে গলিয়ে তুমিই আমাকে মুক্ত করেছ, কাজেই তোমায় প্রাণ-ভরে ধন্যবাদ দিচ্ছি।

সাধু বিরক্ত হয়ে বল্‌ল,—তুমি তো আমায় ধন্যবাদ দিলে অনেকখানি, কিন্তু ভাইয়েরা ফিরে এলে যে আমার পিঠের চামড়া পুড়িয়ে ছাড়বে—এই পিকদানীর জন্যে। এখন ভাইদের কি ব'লে বোঝাবো যে পিকদানীটা একেবারেই খোয়া গেছে। তুমি তো আচ্ছা বিপদ ঘটালে দেখ্‌চি।

রূপকুমার হেসে উত্তর করলো,—আমি মুক্ত হোলেম ব'লেই তোমার বিপদ ঘটবে—তা-ও কি হয় ?

সাধু বিষণ্ণ ভাবে বল্‌ল,—তুমি তো আমার ভাইদের জানো না—কি মেজাজের লোক তারা। ফিরে এসে তারা এই কাণ্ড দেখ্‌লেই ডাণ্ডা তুলে মারবে কয়েক ঘা আমার মাথায়,—সঙ্গে তুমিও বাদ যাবে না।

রূপকুমার হেসে বল্‌ল,—ওহে, অতো ভাবনা করলে চলে না ;—একটু শক্ত সামর্থ না হ'লে দুনিয়ায় কোন কাজ করা যায় না। এই তো দেড়শ' বছর পিকদানীর ভিতর আট্‌কা পড়েছিলুম—এইবার হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। তবু দেখ্‌লে, একটুখানি দমে যাই নি,—যেমন ছিলুম, ঠিক তেম্নি আছি। অতো ভড়কালে কি কাজ চলে ?—না, দুনিয়ায় কিছু করবার যো' আছে। যা হোক, তোমাকে একটা কথা ব'লে যাই, মনে রেখো—যখন যেমন, তখন তেমন। তাড়াতাড়ি কিছু লাভ করতে গেলেই বিপদ হ'বে। বুঝে সুঝে সকল সময় নিজের কাজ ক'রে যেও—আখেরে দেখ্‌বে তোমার ভাল হবে।

সাধু উত্তর করলো,—হাঁ, তাতো সত্যি কথা।

রূপকুমার পুনরায় বল্‌ল,—তারপর, তুমি আমার একটা মস্ত উপকার করেছ। দেড়শ বছর এই পিকদানীর ভিতর দম বন্ধ হয়ে পড়ে থাকা যে কি কষ্ট—তাতো বুঝতেই পাচ্ছ। সেই কষ্ট থেকে আজ মুক্ত হোলেম। যা হোক, তোমাকে আমি একটা উপকার ক'রে যাচ্ছি,—তোমার সকল কষ্টই তাতে দূর হবে। ঐ পাহাড়ের শুষ্ক ঝর্ণা ধরে তুমি আলোর পাহাড়ে উঠে যেও। সেখানে মস্ত বড় একখানা কালো পাথর পড়ে আছে, সেখানা উল্টে ফেল্‌লেই রূপোর খনির খোঁজ পাবে—তাতেই তোমার সকল দুঃখকষ্ট ঘুচবে। কিন্তু সাবধান, যখন যেমন তখন তেমন—এই উপদেশটা ভুলে যেওনা।

সঙ্গে সঙ্গে রূপকুমারের মূর্ত্তিটিও অদৃশ্য হোল। সাধু চেয়ে দেখ্‌লো,—পাত্রের তলায় এক টুক্‌রো রূপো ঝক্‌ঝক্‌ কচ্ছে।

আগাগোড়া সমস্ত ঘটনাগুলিই সাধুর নিকট স্বপ্নের ন্যায় বোধ হোল।

দুই ভাই রামলাল ও হীরালাল সেই সময় ঘরের ভিতর ঢুকে পাত্রের রূপোর টুক্‌রো খানা কুড়িয়ে নেবার জন্য ভারি সোরগোল সুরু করলো। আগাগোড়া ঘটনাটি যেমন ঘটে-

হীরালাল দৌড়ে বের হয়ে যেতেই রামলাল পিছন থেকে তার টিকি ধরে ফেলল

ছিল, সাধু সরল ভাবে ভাই দুটির কাছে ব'লে ফেল্‌ল। ফলে দুই ভাইয়ের মধ্যে সেখানে কে আগে যাবে এই নিয়ে মহা কলহ সুরু হোল। হীরালাল দৌড়ে বের হয়ে যেতেই রামলাল পিছন থেকে তার টিকি টেনে ধরলো। সেই গোলমাল থামাতে গ্রামবাসীরা সেখানে ছুটে এল। গোঁয়ার হীরালাল এমন জোরে ছুটে চলেছিল যে আস্ত টিকিটা রামলালের হাতেই থেকে গেল।

হীরালাল সোজা হাকিমের কাছে গিয়ে হাজির হোল—টিকিছেড়ার মোকদ্দমা করতে। গ্রামবাসীরা সকলেই সাক্ষ্য দিল। বিচারে রামলালের তিন মাস জেল হোল।

চার

রামলালের জেল হোতেই হীরালাল মনে মনে ভারি খুসী হোল। এখন সে একলাই রূপোর খনির মালিক হ'তে পারবে ;—একেবারে সব পথ খোলসা। জেল থেকে বের হ'তে রামলালের এখানো তিন মাস বাকি ; এই ফাঁকে হীরালাল ষোল আনা কাজটা হাসিল ক'রে ফেল্‌বে।

একদিন সকাল বেলা আলোর পাহাড়ের চূড়া লক্ষ্য ক'রে হীরালাল রওনা হোল। শুষ্ক ঝর্ণার পাশে সে সোজা উপরে চলেছে। গাছপালার উপরে পাৎলা কোয়াসার স্তর একখানি ঢাকাই ওড়নার মতোই শূন্যে ঝুলছে! উপরে কেবল মাত্র পাহাড়ের চূড়াটুকু নজরে পড়ে। ভোরের আলোর রঙীন ছোঁপ্‌ লেগে সেখানটা বাতির শলতের মতোই জ্বল্ জ্বল্ করছে! হীরালাল বিস্ময়ে অবাক হয়ে দেখ্‌লো, পাহাড়ের গায়ে সাদা বরফগুলি যেন হীরা-পান্নারই মতোই ঝক্ ঝক্ কচ্ছে! আহা! সেগুলি যদি সত্যি হীরা হ'তো তবে হীরালাল সেগুলি কুড়িয়ে এনে নিজের নাম সার্থক

হীরালাল পাহাড়ের দিকে ছুটে চলেছে।

করতো। হীরালালের আশা ক্রমেই বেড়ে চল্‌ল। একটা সত্যি হীরার পাহাড় কুড়িয়ে পাওয়া যে আশ্চর্য্য নয়! হীরালালের মনে এই অসম্ভব কল্পনা জাগ্রত-স্বপ্নের মতোই হয়ে দাঁড়ালো। পৃথিবীর মধ্যে সে যে একজন শ্রেষ্ঠ ধনী হয়ে উঠবে, এই চিন্তায় তার বুকের ভিতর ক্রমাগত তোলপার সুরু হোল। এত ঐশ্বর্য্যের মালিক হোলে জীবনে তার আর কি চাই? কেবল টাকা—টাকা—টাকা! এই টাকা দিয়েই তো জগতের কাটা মন জোড়া লাগে—সকল দুঃখ কষ্ট দূর হয়। কিন্তু টাকা আবার এমি পাজি জিনিস যে তার পিছনে সর্ব্বদা একটা দুর্ভাবনা, নানা রকম অশান্তি, উদ্বেগ, এমন কি খুনোখুনী পর্য্যন্ত লেগেই আছে। তবু টাকা না হোলে তো চলে না! যত গোল এই টাকা নিয়েই সৃষ্টি হয়। কেননা, আজকাল যত গোলমালের কারণ—এই টাকা; আর এই টাকার জন্য না পারে হীরালালের তেমন অসাধ্য কাজও নেই! এই চিন্তায় কতখানি পথ যে এগিয়ে এসেছে—সে খেয়াল তার ছিল না। কাজেই আনাড়ির মতো জোরে পাহাড়ে চলার দরুণ সহজেই সে ক্লান্ত হয়ে পড়লো। কিছুদূর গিয়েই হীরালালের ভয়ানক

তেষ্টা পেল। সঙ্গের বোতল থেকে খানিকটা জল সে গলায় ঢেলে নিল।

কিছু দূরে গিয়ে সে দেখ্‌লো, একটা কালো রঙের কুকুর রাস্তার এক ধারে পড়ে কাৎরাচ্ছে। একটু জল না পেলে তৃষ্ণায় প্রাণীটি মারা যায়। ধাক্কা মেরে প্রাণীটিকে রাস্তা থেকে সরিয়ে হীরালাল নিজের রাস্তা সাফ্ করলো। সঙ্গে সঙ্গে একটা কালো মেঘ যেন হঠাৎ চারিদিক ছেয়ে ফেল্‌ল— বিদ্যুতের ঝিকিমিকির সঙ্গে মেঘের গর্জ্জন শোনা গেল। সেই শব্দে হীরালালের মনে কেমন একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হোল।

হীরালাল জলের বোতলটি কোমরে গুঁজে মুঠ্ ক'রে মোটা লাঠিখানা ধরে হন্ হন ক'রে উপরে ছুটে চল্‌ল। এমন সময় এক বৃদ্ধ হাঁপাতে হাঁপাতে তার সাম্‌নে এসে দাঁড়াল। বৃদ্ধ দুই হাত হাঁটুর উপর রেখে কাতর ভাবে হীরালালের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু জল প্রার্থনা করলো।

হীরালাল ভ্রূভঙ্গী ক'রে পথ ছেড়ে দাঁড়াবার ইঙ্গিত করতেই বৃদ্ধটি করুণ কণ্ঠে বল্‌ল,—তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে গেল, একটু জল।

তা' হ'লে আমার রয়ে গেল ; জল অত সস্তা নয়—ব'লেই হীরালাল বৃদ্ধের পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

কিছুদূর গিয়েই হীরালাল দেখ্‌লো,—সাম্‌নে মস্ত বড় একটা খাদ, এটা পার হয়ে গেলেই আলোর পাহাড়ে চড়বার সোজা পথ। খাদটা ঘুরে ওপারে যাবার জন্য কিনারা ঘুরে একটা সঙ্কীর্ণ পথ। যখন সে সেই পথের ঠিক মধ্য স্থলে, তখন হঠাৎ একটা আল্‌গা পাহাড় উপর থেকে গড়িয়ে আস্‌ছে দেখ্‌তে পেল। ভয়েই হীরালালের প্রাণ শুকিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি একপাশে সরে যাওয়াও সহজ নয়—কেননা একদিকে মস্ত বড় খাদ হাঁ হয়ে রয়েছে ; অন্যদিকে খাড়া উঁচু পাহাড়। দেখ্‌তে দেখ্‌তে রাশি রাশি শিলা খণ্ড উপর থেকে গড়িয়ে এসে হীরালালের গায়ে পড়তে লাগলো। সেগুলিকে ঠেকিয়ে রাখে কার সাধ্য! বড় বড় পাথরগুলির চাপে হীরালালের শরীর গুড়ো গুড়ো হয়ে ধূলার মতো মিলিয়ে গেল।

পাঁচ

বহুদিন হীরালালের খবর না পেয়ে সাধু মহা ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো। সে অতি কষ্টে কিছু টাকাকড়ি যোগাড় ক'রে জরিমানার টাকা দিয়ে রামলালকে কারাগার থেকে মুক্ত ক'রে আনলো। হীরালাল বহুদিন থেকেই নিরুদ্দেশ—রামলাল এই খবর পেয়ে কপোর খনি নিজের একলার হাতে মনে ক'রে ভাইয়ের খোঁজ করতে যাচ্ছে ব'লে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লো। সে ব্যাগের ভিতর পুরে কিছু খাবার ও এক বোতল জল সঙ্গে নিল।

পূর্ব্বে যেখানে হীরালালের সঙ্গে বৃদ্ধের দেখা হয়েছিল রামলাল সেখানে পৌঁছাতেই সেই বৃদ্ধ এসে হাজির হোল।

বৃদ্ধ রামলালের দিকে তাকিয়ে বল্‌ল,—মাস তিনেক আগে ঠিক তোমারই চেহারার একটি লোক এখানে এসেছিল।

রামলাল বৃদ্ধের কথায় বিস্মিত না হয়ে বল্‌ল,—হাঁ, সে আমার ভাই। আচ্ছা, তা'র কি হোল বল্‌তে পার?

বৃদ্ধ বল্‌ল,—পিছল্‌ পাহাড়ের চাপে হাড় গুঁড়িয়ে সে মারা গেছে।

এই খবর জেনে রামলালের মনে কোন দুঃখ হয়েছে ব'লে মনে হোল না।

মুহূর্ত্তমধ্যেই বৃদ্ধকে সেখানে আর দেখা গেল না।

রামলাল কিছুদূর এগিয়েই দেখতে পেল, পূর্ব্বে যেখানে প্রকাণ্ড খাদ ছিল, পাহাড় ধ্বসে সেই স্থানটা সমতল হয়েছে; সেখানে ছোট্ট একটা হরিণশিশু আহত অবস্থায় পড়ে আছে। তার মুখ বেয়ে গেঁজেল এবং চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ছে। একটু জল মুখে ঢেলে দিলে হরিণ শিশুটি হয়তো প্রাণে বেঁচে ওঠে। রামলাল নিজের জলের বোতলটি একবার নেড়ে দেখ্‌লো—তাতে জল সম্পূর্ণই ভরা আছে। তারপর মনে মনে ভাব্‌লো,—না, এমন বহুমূল্য জল, এমন ভাবে খোয়ানো যায় না। মরুক গে ছাই—ওতে আমার কি?

একটু এগিয়ে যেতেই একটা পাখীর ছানা গাছ থেকে ধপ্‌ ক'রে মাটিতে পড়্‌লো।

রামলাল সেটিকে হাত দিয়ে তুল্‌তেই চ্যাঁ চ্যাঁ আওয়াজ

ক'রে ঠোট দু'খানা একটু ফাঁক করলো। এক ফোঁটা জল পেলে পাখীর ছানাটি সুস্থ হ'তো; কিন্তু রামলাল একটা পাথরের ঢিপির উপর সেটাকে ফেলে জোরে চল্‌তে লাগ্‌লো।

হঠাৎ একটা শোঁ শোঁ আওয়াজ রামলালের কানে এল।

একটা উত্তরে মেঘ গাছপালা কাঁপিয়ে পাগলা হাতীর মত যেন সেদিকে ছুটে আস্‌ছে। রামলাল তাড়াতাড়ি একটা উচু ঢিপির উপর উঠে দাঁড়াবার জন্য ছুট্‌তে লাগ্‌লো। ঝম্ ঝম্ ক'রে তখুনি বৃষ্টি নেবে এল।

রামলাল পাহাড়ের একটা ঢিপির পাশ ঘেঁসে এসে দাঁড়ালো। একটু পরেই হরিণ শিশুটি তার পাশ কেটেই ছুটে গেল। পাখীর ছানাটিও তখন ঢিপির উপর থেকে পাখা দুলিয়ে শূন্যে উড়ে মিলিয়ে গেল।

তখন উপর থেকে পাহাড়ী জলের স্রোত নীচে নেবে আস্‌বার শব্দ রামলালের কানে এল। ঢিপির পাশে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি থেকে সে আত্মরক্ষার চেষ্টা কচ্ছিল, ঠিক তার উল্টো দিকে জলের স্রোত উচু হয়ে আস্‌ছে। রামলাল তাড়াতাড়ি সেই ঢিপি বেয়ে উপরে উঠবার চেষ্টা করলো।

টিপির গায়ে সেওলা জমে এত পিচ্ছিল হয়েছে যে তাতে হাতের আঙুল কিছুতেই আট্‌কায় না—বার বার ফস্কে যেতে লাগ্‌লো। এদিকে জলের স্রোত হুড় মুড় ক'রে এসে পড়লো ; সঙ্গে সঙ্গে টিপির গায় ধাক্কা খেয়ে রামলালের মস্তক চূর্ণ হয়ে সেই স্রোতে ভেসে অদৃশ্য গেল।

ছয়

সাধুলাল ভাই দুটির জন্য বহুদিন অপেক্ষা করলো। তারপর নিজেই তাদের খোঁজ করতে আলোর পাহাড়ের দিকে রওনা হোল।

সাধু পাহাড়ের কিছুদূর উঠেই দেখলো, এক জরাজীর্ণ বৃদ্ধ রাস্তার উপর মুমূর্ষ হ'য়ে পড়ে আছে। তাড়াতাড়ি সে বৃদ্ধকে তুলে নিজের গায়ের চাদরখানা ঘাড়ের নীচে গুঁজে দিয়ে বাতাস করতে লাগলো। একটুখানি শীতল জল চোখে মুখে দিতেই বৃদ্ধের চৈতন্য হোল। সাধু নিজের খাবার বের করে বৃদ্ধকে খেতে দিল। বৃদ্ধ সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে উঠলো। সাধু বল্‌ল,—আহা, বুড়ো মানুষ! তুমি তো আজ বড্ড কষ্ট পেয়েছ। চল, তোমায় বাড়ী রেখে আসি।

বৃদ্ধ বল্‌ল,—না, ভাই, তোমার আর যেতে হবে না; এখন আমি খুব চলতে পারবো। এইবার তুমি যাও।

বৃদ্ধের কথা শুনে মহা খুসী হয়ে নিজের জিনিষপত্রগুলি গুছিয়ে সাধু আবার রওনা হোল।

সাধু কিছুদূর এগিয়েই দেখলো, এক হরিণী পাহাড়ে লাফ দিতে গিয়ে পা ভেঙ্গে রাস্তায় পড়ে আছে। সাধু তাড়াতাড়ি নিজের কাপড়খানা ছিঁড়ে হরিণীর পায়ে একটা ভাল রকম পট্টি জড়িয়ে দিতেই হরিণী সাধুর পা চাটতে লাগলো। বনের পশুর এতখানি কৃতজ্ঞতা দেখে সাধুর চোখ জলে ভরে এল। একটুখানি করুণা পেলে জগতে কতখানি নির্ভরতা ও আনন্দের কারণ উপস্থিত হয়—ইহাই তার দৃষ্টান্ত। জগতে সকলের প্রাণেই যদি করুণা বিদ্যমান থাকতো, তবে জগতের সকল দুঃখদৈন্য যে এই আনন্দ-বন্যায় প্লাবিত হ'তো—তাতে আর সন্দেহ কি।

হরিণীটি যখন সুস্থ হয়ে চলতে আরম্ভ করলো তখন সাধুও আস্তে আস্তে নিজের গন্তব্য পথে রওনা হোল।

কিছুদূর এসেই সাধু দেখলো, পাহাড়ে ভীষণ ঝড় দেখা দিয়েছে। বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে মেঘে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগলো এবং কড় কড় শব্দে বাজ পড়া সুরু হোল। বাতাসে বাতাসে ধাক্কা লেগে যেন মেঘের সমুদ্র উথলে উঠলো! তারপর আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টির বন্যা চারিদিকে নেবে এল। সাধু স্থিরভাবে একস্থানে আশ্রয়ের জন্য দাঁড়ালো। এমন

সময় একটা পাখীর ছানা গাছের পাতার সঙ্গে এসে মাটিতে গড়িয়ে পড়লো। সাধু তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে পাখীর ছানাটিকে তুলে এনে সযত্নে বুকের তলে রাখলো। ছানাটি শীতে এবং ঝড়-বৃষ্টিতে প্রায় আধমরা হয়েছে। সাধু নিজের গরম জামার তলে রেখে সেটিকে সুস্থ করলো; তারপর একটু একটু খাবার মুখে দিতেই পাখীর ছানাটি বেশ সবল হয়ে উঠলো।

একটুপরে ঝড়বৃষ্টিও থামলো। সাধু তখন পাখীর ছানাটিকে গরম জামার ভিতর থেকে বের ক'রে আদর ক'রে তার ঠোঁটে একটি চুমো দিল। সেটি মনের আনন্দে শীষ দিতে দিতে গাছের ডালে গিয়ে বসলো; তারপর সবুজ পাখা দুলিয়ে নীল আকাশের পানে উড়ে চল্‌ল।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে চারিদিক পরিষ্কার হয়ে সূর্য্যের রঙীন রশ্মিতে চারিদিক প্রফুল্ল হয়ে উঠলো। ক্রমে আলোর পাহাড়ের নিকটে এসে সাধু দেখ্‌লো, রৌদ্র লেগে পাহাড়ের বরফের চূড়া গলে রূপোর ঝর্ণার মতো নানা আকারে গড়িয়ে পড়ছে! মাথার উপর ঘন কোয়াসা মেঘের মতো জমাট হয়ে চাঁদোয়ার মত ছড়িয়ে রয়েছে।

তার নীচের দিকে পাথরের পাঁচিলের মত একটা উঁচু বেষ্টনী—সেটা পার হয়ে গেলেই আলোর পাহাড়ের নাগাল পাওয়া যায়।

সাধু এমন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে তৃষ্ণায় তার জিভ্ শুকিয়ে গেছিল—মুখে কথা সরে না। তাড়াতাড়ি সে জলের পাত্রটা খুলে দেখ্‌লো যে তার তলায় তিন ফোঁটার বেশী জল অবশিষ্ট নাই। অগত্যা সেই পাত্রটা সে মুখের উপর উঁচু ক'রে ধরলো। কিন্তু এই তিন ফোঁটা জলেই তার সমস্ত তৃষ্ণা মিটে গেল,—শরীরেও যেন সে বল পেল।

সাধু এইবার তাড়াতাড়ি একেবারে আলোর পাহাড়ের চূড়ায় উঠে পড়লো। সেখানে একখানা কালো পাথর পড়েছিল। সেখানা উল্টিয়ে ফেল্‌তেই ঝির ঝির ক'রে স্বচ্ছ একটা জলের ঝর্ণা ফুটে বেরুলো।

সাধু এইবার ঝর্ণা থেকে এক অঁাজলা জল পান করবার জন্য যেই মুখে দিতে গেল, অম্নি পূর্ব্বেকার সেই বৃদ্ধ পাশে দাঁড়িয়ে নিষেধ ক'রে বল্‌লো,—ওকি কচ্ছো? এতটা হাঁপিয়ে এসে এখনি জলপান করলে তুমি যে সর্দ্দি-গর্ম্মি হয়ে মারা যাবে।

সাধু ঝর্ণা থেকে এক আঁজলা জল যেই মুখে
দিতে গেল অমনি পূর্ব্বের বৃদ্ধ

সাধু জল ফেলে দিয়ে পিছনে সাধুর দিকে তাকিয়ে বল্‌লো,—বাঃ! তুমিও যে এখানে এসে পড়েছ?

বৃদ্ধ হেসে জবাব দিল,—খুব আশ্চর্য্য মনে হচ্ছে বুঝি?

সাধু উত্তর দিল,—এতে আশ্চর্য্য হওয়াটা তো কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।

বৃদ্ধ উত্তর দিল,—কিন্তু এর চেয়েও তো আশ্চর্য্যের বিষয় তুমি নিজেই দেখ্‌তে পেলে।—কই, তাতে তো তোমাকে তেমন আশ্চর্য্যান্বিত দেখ্‌চি ব'লে মনে হচ্ছে না।

সাধু উত্তর করলো,—তুমি যে কী বল্‌চো—তাতো আমি কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছি না।

বৃদ্ধ হেসে উত্তর করলো,—সেটাও আশ্চর্য্যের বিষয় বটে তুমি এসেছিলে রূপোর খনির খোঁজ করতে—এসে দেখ্‌তে পেলে সাদা জলের ঝর্ণা! এটা আশ্চর্য্যের বিষয় বই কি?

সাধু উত্তর দিল,—তুমি এ খবরটা জান্‌লে কি ক'রে?

বৃদ্ধ উত্তর দিল,—তবে না জেনে যে কথাটা বলি নি' এটা তো খুবই তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছ।

সাধু জবাব দিল,—কেবল রূপার খনি খুঁজতে এসে-ছিলুম—এটাও একেবারে ঠিক কথা নয়।

বৃদ্ধ বল্‌ল,—হাঁ, তা'ও জানি,—ভাইদের খোঁজ করতে বুঝি?

সাধু বল্‌ল,—এতটা যদি জানই, তবে ব'লেই ফেলনা, আমার ভাইদের কি হোল?

বৃদ্ধ উত্তর করলো,—ভাইরা তোমার মারা গেছে। এত নিষ্ঠুরতা প্রকৃতি কিছুতেই ক্ষমা করলে না;—সেটা তাদের নিজের কর্ম্মফলও বলতে পার।

ভাইদের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সাধু মনে মনে ভারি দুঃখ বোধ করলো। নিষ্ঠুর ভাইদের জন্যও তার দু' চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগ্‌লো।

বৃদ্ধ বল্‌ল,—ভাইদের হারিয়ে তোমার দুঃখটা খুবই হয়েছে দেখ্‌চি, কিন্তু রূপার খনি পেলে না ব'লে তোমার যে একটুও আপশোষ হচ্ছে না।

সাধু উত্তর দিল,—দেখুন, একটা বড় কথা আমি শিখে রেখেছি, সেটা হোল 'যখন যেমন তখন তেমন'। সেটা কতকটা শিখেছি ব'লেই দুঃখকষ্টের জন্য একেবারে হাত পা ছেড়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকি না। সেজন্য রূপোর খনি পেলাম না ব'লে দুঃখটাও আমার তেম্নি হয়েছে; কিন্তু উপস্থিত যে

জল পান ক'রে ঠাণ্ডা হবো—এইটেই হোল পরম সুখের কথা।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে বৃদ্ধের চেহারা আশ্চর্য্য রকম বদলে গেল। হঠাৎ চেয়ে দেখ্‌লো, ঝড়ের রাতের সেই বুড়ো গায়ে ঢিলা মেরজাই আর লম্বা টুপিটা মাথায় দিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে হাস্‌চে!

বিস্ময়ে সাধু সেই বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে বল্‌ল,—তোমার এই বহুরূপী সাজটা এতক্ষণ কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলে?

বৃদ্ধ হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌ল,—আমি যে বহুরূপী এতদিন পরে বুঝি টের পেলে? পৃথিবীকে যে আমি বহুরূপে সাজাই—সেটা তো সর্ব্বত্রই দেখতে পাও। আমি না হোলে কি এই সবুজ গাছপালার শোভা, এই ঝর্ণা, নদী তুষার-ঢাকা পাহাড়ের এই অপরূপ সৌন্দর্য্য কখনো দেখ্‌তে পেতে?—সবই তো মরুভূমি হয়ে যেতো। পূবো হাওয়া চারিদিকের মেঘ-বাদলা টেনে এনে পৃথিবীতে বহুরঙের, বহুরূপের ভেল্কী আমদানী করে। সেই জন্য আমাকে যদি বহুরূপী বল কিম্বা যাদুকর ব'লে গালাগালিও দেও—রাগ করবো না।

এইবার তুমি ঘরে যাও। দেখ্‌বে সেখানেই তোমার

রূপোর খনি মজুত আছে। আর সেই উপদেশটা ভুলোনা —যখন যেমন তখন তেমন।

* * *

সাধু বাড়ীতে ফিরে এল। সেখানে এসে দেখে, পাহাড় থেকে যে স্বচ্ছ ঝর্ণা নেবে এসেছে, তাতে সাধুর সমস্ত জমি জিরাত খুব উর্ব্বরা হয়েছে।

সাধু প্রাণপণে কাজ করতে লেগে গেল। সে বছর জমিতে এত ফসল জন্মালো যে খুব অল্পদামে জিনিষ পত্র বিক্রি ক'রেও প্রচুর টাকাকড়ি তার হাতে এলো।

প্রতি বৎসরই সাধুর ফসল ভালো হতে লাগলো। সাধু আরো অনেক জায়গাজমি বাড়ালো। মস্ত বড় ফলের বাগান করলো। সাধুর ঘরে অফুরন্ত খাবার। সাধু প্রতিবেশী সকলকে প্রচুর খাবার দাবার দিতে লাগ্‌লো। গরিব দুঃখী সকলকে প্রচুর টাকাকড়ি খাবার দাবার বিলিয়ে মহা সুখে সাধুর কাল কাটতে লাগ্‌লো!

সাধু বুড়োর সেই উপদেশটা আজো ভোলে নি'—যখন

যেমন তখন তেমন। অর্থাৎ যখন যেই কাজটি হাতের কাছে আস্‌বে—তখনি সেই কাজটি সুসম্পন্ন করতে হবে—ভবিষ্যতের দোহাই দিয়ে ফেলে রাখলেই কাজটি পণ্ড হবে। আর ভগবান যখন যেমন রাখেন, ঠিক সেই রকম ভাবেই চল্‌তে হবে; তা' হোলেই সংসারে সুখ-শান্তি বজায় থাক্‌বে।

কলিকাতা

১৩৩৮

জরির জুতা

জরির জুতা

বাপের তিন ছেলে। বড় দুটির বিয়ে হয়েছে—বড় ঘরে। কাজেই ভারি গয়নাগাটির সঙ্গে বৌ দু'টির দেমাকটা নেহাৎ হাল্কা ছিল না! বড় ছেলে তো দু'দিন না যেতেই চোখে সুর্ম্মা টেনে আর কানে আতর গুঁজে 'গুল-বাগে' হাওয়া খেতে সুরু করলো। দ্বিতীয়টিও 'ভবিয়তের' দোহাই দিয়ে ফল্‌সার কাঁচা সরবৎ দিনে পাঁচ সাত গ্লাস জিভে উড়িয়ে দেয়; আহারেও দিল্লির মোরব্বা আর চীনে কাবাব না হোলে তার মেজাজ সরিফ থাকে না!

বুড়ো বাপ হুকুমচাঁদ লোকের কাছে ব'লে বেড়ায়,—বড় ছেলে দু'টির জন্ম তার সকল কায়-কারবার 'বরবাদ' হ'তে চলেছে। এখন উপায় কি? এতকাল সে চাঁদনী চকে একখানা দোকান চালিয়ে বিস্তর টাকাকড়ি ঘরে

জমিয়েছে ; সে মারা গেলেই এই টাকাকড়ির ছুটো ক'রে পাখ গজিয়ে ছুদিনেই যে সব ফতুর হবে—এ বিষয়ে তার কোন সন্দেহই রইলো না !

একমাত্র ছোট ছেলে মুলুকচাঁদ. খুব পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান। খুব ভোরে বাড়ী থেকে এসে সে চকের দোকান খানি খোলে এবং কাজকর্ম্ম দেখে। বেলা বারোটার পর যখন সে ছুপুরের খাবার খেতে বাড়ী আসে, তখন বড় ভাই আরাম চাঁদের নাকের ডাক শুনে ঘরের পায়রাগুলি অবধি ঘাড় কাৎ ক'রে চুপ ক'রে থাকে। কাজেই মুলুক চাঁদ চুপে চুপে বাড়ীতে ঢুকে কোন রকমে ছুটো গিলেই চোরের মতো বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসে।—আরামচাঁদের ঘুম দৈবাৎ ভেঙ্গে গেলে তখুনি সে পাড়া কাঁপিয়ে তুলবে।

মুলুক চাঁদের খাওয়াপরার খোঁজ বাড়ীতে কেউ বড একটা রাখে না ; রাত্রিবেলা এক মুঠো ছাতু খেয়ে সে প্রায়ই দোকানে ঘুমিয়ে থাকে। বাপ সময় সময় দোকানের হিসাব পত্র দেখ্‌তে আসেন।

রাত্রি বেলা মুলুক চাঁদ দোকানের খাতাপত্র মিলাচ্ছে, তখন শুন্‌তে পেল রাস্তায় এক ফকির হেঁকে চলেছে,—

'একশো রূপেয়া কোই দে দেনা
সাচ্ মিল যায়ে গা হীরে দানা।'

মুলুক চাঁদ তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলো,—ফকির সাব্, তুমি হেঁকে কি বিক্রি কচ্ছ?

ফকির উত্তর দিল,—কেউ যদি আমায় একশ' টাকা দেয়, তবে হীরের টুক্‌রোর মতো একটি টুক্‌টুকে বউয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দেই।

ফকিরের কথা শুনে মুলুকচাঁদের মনে বড্ড লোভ হোল। হীরের টুক্‌রোর মত টুক্‌টুকে বউয়ের কথা শুনে কারই না লোভ হয়!

মুলুক চাঁদ গুণে দেখ্‌লো, বাক্সে তার ঠিক এক শত টাকাই আছে।

মুলুক চাঁদ সেই টাকাটা ফকিরের হাতে তুলে দিল।

ফকির মহা খুসী হয়ে বল্‌ল,—কাল সন্ধ্যাবেলা তুমি আমার সঙ্গে দেখা ক'রো—নিশ্চয়ই হীরের টুক্‌রোর মত একটি টুক্‌টুকে বৌ তোমার ক'রে দিবো।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা মুলুকচাঁদ ফকিরের বাড়ী গেল। ফকির তাকে ভাল জামা-কাপড় পরিয়ে, মাথায় একটা তাজ,

পায়ে এক জোড়া জরির জুতা পরিয়ে দিতেই মুলুক চাঁদের চেহারা ঠিক রাজপুত্রের মতো দেখ্‌তে হোল।

তারপর ফকির তাকে দূরে এক বনের ভিতর নিয়ে একটা বটগাছে চড়ে বসে থাক্‌তে বল্‌ল।

মুলুকচাঁদ সেই গাছে চড়ে বস্‌তেই সেই গাছটা শোঁ শোঁ ক'রে হাওয়ার উপর দিয়ে ছুটে চল্‌ল। অনেক দূরে এসে গাছটা এক জায়গায় ঠিক পূর্ব্বের মতো মাটিতে বসে পড়লো।

মুলুকচাঁদ গাছের উপরই চুপ ক'রে বসে রইলো।

কিছুক্ষণ পরে একদল বিয়ের যাত্রী খুব ধূমধাম ক'রে সেই পথ দিয়ে বর নিয়ে চলেছে। সেই গাছতলায় এসে সকলে বিশ্রাম করতে লাগলো।

ইতিমধ্যে বরের খুড়ো সকলকে ডেকে বল্‌ল,—কনের বাড়ীতে কাণা ভাইপোকে নিয়ে গেলে কনের বাপ রেগে হয়তো মেয়েই বিয়ে দেবে না। বরং এক কাজ কর, কোথাও থেকে একটি ছেলে জুটিয়ে এনে বর সাজিয়ে তাকে নিয়ে যাই; বিয়ে হয়ে গেলে ফেরবার পথে তাকে রেখে কনে আর ভাইপোকে সঙ্গে নিয়ে গেলেই হবে।

বাস্তবিক বর একে কাণা, তার উপর চেহারা-খানাও ভারি বিশ্রী। এই বর দেখে কনে পাওয়া সত্যিই দুরূহ।

কাজেই খুড়ার পরামর্শই ঠিক রইলো। সকলে স্থির করলো, বর এই গাছতলায়ই বসে থাক, তার বদলে একটি ছেলে খুঁজে বের ক'রে নিলেই হবে।

এমন সময় মুলুকচাঁদ সেই গাছ থেকে নেবে এল। রাজপুত্রের মতো তার চেহারা দেখে সকলে স্থির করলো, বরের কাজটা এঁকে দিয়েই সেরে নিয়ে আসা যাক।

মুলুকচাঁদ বরযাত্রীর সঙ্গে কনের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হোল।

খুব ধূমধাম ক'রে বিয়ে হোল। বিয়ের পর ঠিক হোল, কনে নিয়ে বরযাত্রীর দল আজই বাড়ী ফিরে যাবে।

বর জরির জুতা ছেড়ে সেই-যে বিয়ের আসরে নেবেছিল, সেখান থেকেই সকলে তাকে কোলপাঁজা ক'রে তুলে এনে পাল্কীতে বসিয়ে দিল।

বিয়ের আসরে চেলীর কাপড়-পরা কনের চেহারা দেখে সত্যিই মনে হয়েছিল—এ যেন ঠিকই হীরের টুক্‌রো!

কনেও বরের রাজপুত্রের মতো চেহারা দেখে খুবই খুসী হয়েছিল।

এদিকে কনের যাবার আয়োজন হচ্ছে। বাইরের ঘরে বরযাত্রীর লোকেরা ফিস্ ফিস্ ক'রে কথাবার্ত্তা বল্‌ছে। বাড়ীর দাসী বেড়ার আড়াল থেকে সেই পরামর্শের কথা শুন্‌তে পেল।

তখুনি সে বাড়ীতে গিয়ে কনের মাকে সকল কথা খুলে বল্‌ল।

ওমা, কী সর্ব্বনাশ! ওরা ঠকিয়ে কনে নিয়ে যেতে এসেছে। আমরাও তার ঠিক ব্যবস্থাই কচ্ছি।

তাদের বাড়ীতে ছিল, এক কুঁজো, টেঁরা এবং কালা দাসী—তাকে চেলির সাড়ি পরিয়ে কনের টোপর মাথায় দিয়ে ডুলীতে এনে তুলে দিল।

বেহারা তো সেই পাল্কী ডুলী কাঁধে ক'রে বরযাত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে চল্‌ল।

পূর্ব্বের সেই গাছতলায় এসে খুড়ো তখন মুলুকচাঁদকে বিদায় দিয়ে কাণা ভাইপোকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী রওনা হোল।

মুলুকচাঁদ মহা দুঃখে পুনরায় সেই গাছের উপর চড়তেই গাছটি ঠিক পূর্ব্বের মতো আকাশে উড়ে নিজের সহরে এসে পৌঁছালো।

ভোর বেলা মুলুকচাঁদ নিজের দোকানের দরজা খুলে পোষাকপত্রগুলো ছেড়ে পুনরায় দোকানেব কাজে লেগে গেল।

দুই

এ দিকে কনে বেশ ডাগর হয়েছে। কনের বাপ মায়ের মনে মহা ভাবনা—এমন রাজপুত্রের মতো জামাই পেয়েও তাকে হারাতে হোল।

কনে রাজপুত্রের মতো সেই বরের কথা সর্ব্বদাই ভাবে; জীবনে মাত্র একটিবার তার ছ' চোখের দেখা, তা' ছাড়া বরের আর কোন পরিচয়ই তো সে জানে না। ঠিকানাও কিছু রেখে যায় নাই যে বরের সঙ্গে গিয়ে দেখা-সাক্ষাৎ করবে। হায়, কি উপায়?

বর যে জরির জুতো জোড়া বিয়ের রাত্রে ফেলে গেছে, সেইটি মাত্র তার কাছে আছে।

একদিন সেই কনে রতনবাঈ বাপকে গিয়ে বল্‌ল,—বাপ্‌জী, আমি দেশ-বিদেশে সওদাগরী করবো, আমায় একটা নৌকো সাজিয়ে দেও।

বাপ বল্লেন,—মা, সে কি ক'রে হবে? তুমি যে মেয়ে মানুষ।

রতনবাঈ উত্তর দিল,—আমি পুরুষের পোষাক প'রে দেশ-বিদেশে সওদাগরী চালাবো ; কেউ আমায় মেয়ে ব'লে চিন্‌তে পারবে না।

মেয়ের কাকুতিমিনতিতে শেষটায় বাপ রাজী হয়ে মেয়েকে একটা নৌকো সাজিয়ে দিল।

রতনবাঈয়ের নাম এখন রতন চাঁদ। মস্ত সাত ডিঙা সাজিয়ে এখন সে দেশ-বিদেশে সওদাগরী করে। কিন্তু তার বেসাতের জিনিষ কেবল মাত্র একটি—এক জোড়া জরির জুতা। তার দাম আবার লাখ টাকা।

লাখ টাকার জুতার কথা শুনে সকলেই হেসে উঠে। এই জুতার দাম লাখ টাকা! এই জুতো তো চাদনী চকে হীরালালের দোকানে বড় জোর ন' সিকের বেশী হবে না।

লোকে বলাবলি করে,—ভাই, রাজপুত্রের মতো ছোট্ট এই সওদাগরটা নিশ্চয়ই এক নম্বরের ক্ষ্যাপাটে, তা' না হ'লে বলে এই জুতোর দাম লাখ টাকা!

কেউ যদি জিজ্ঞেস্ করে,—সওদাগর ভাই, তোমার এই জুতার দামটা লাখ টাকা হোল কিসে?

সওদাগর হেসে উত্তর দেয়,—জিনিষের দাম লাখ টাকা

হবে কি পাই পয়সা হবে—সেটা তো খুসী-মর্জ্জির ব্যাপার। দাম জেদা মালুম হোয় তো—মৎ লেনা।

এই অদ্ভুত জুতো বিক্রির খবরটা চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে পড়লো; ক্রমে এই কথাটা মুলুকচাঁদের কানেও উঠলো। ভাবলো, এক জোড়া জুতার দাম লাখ টাকা!—দেখেই আসা যাক্‌না ব্যাপার খানা।

পরদিন মুলুকচাঁদ নদীর ধারে যেখানে নবীন সওদাগরের নৌকা ভিড়েছে, সেখানে গেল জুতো দেখ্‌তে।

রতনচাঁদ সওদাগর মুলুকচাঁদকে দেখেই তো নিজের স্বামী ব'লে চিনে ফেল্‌ল।

মুলুকচাঁদ নবীন সওদাগরের পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলো,—হ্যাঁগা, শুনতে পাই তোমার জুতার দাম নাকি লাখ টাকা?

রতনচাঁদ হেসে জবাব দিল,—কেন, চাই নাকি? দেবো?

মুলুকচাঁদ উত্তর করলো,—না, কেবল দেখতে এসেছি; লাখ টাকা দিয়ে জুতা কিনে পায়ে দেবার মুরোদ আমার নাই।

রতনচাঁদ হেসে বল্‌ল,—কেন্‌বার 'মুরোদ' না থাক্‌লেও

পায়ে দিয়ে বিয়ে করবার সখ তো খুব ছিল! তেমন লোক পাই তো বিনি পয়সায়ই আমার লাখ টাকার বেসাত দিয়ে ফেলি।

এই ব'লেই জুতোখানি মুলুক চাঁদের সাম্নে রেখে খুব হাস্তে লাগলো।

তারপর বল্ল,—এইবার দেখ, বিনি পয়সার বেসাত তোমার কপাল জোরে পেয়ে গেলে।

মুলুকচাঁদ সেই জুতো দেখে ভারি অবাক হোল; তারপর জিজ্ঞেস করলো,—এই জুতো জোড়া তুমি পেলে কোথায়?

রতন চাঁদ উত্তর দিল,—ফেলে এসেছিলে তাই কুড়িয়ে নিয়ে এলাম।

মুলুকচাঁদ আরো অবাক হয়ে বল্ল,—তবে তোমার নাম?

রতন চাঁদ উত্তর দিল,—চাঁদ যখন হাতে পেয়েছি তখন আমার নাম শুধু রতন।

মুলুকচাঁদ অবাক হয়ে বল্ল,—তোমাকে না কাণা বরের লোকেরা পাল্কীতে ক'রে নিয়ে গেছিল?

রতনবাঈ তখন সকল কথা মুলুকচাঁদকে খুলে বলল।

মুলুকচাঁদ রাঙা টুকটুকে বউয়ের দিকে চেয়ে বল্‌ল,—বটে! জুতো দিয়ে এসেছিলাম, তাই আজ তোমায় ফিরে পেলাম।

বউটি হেসে জবাব দিল,—তা' নয় গো, জুতো ফিরিয়ে দিয়েই তো আজ তোমায় ফিরে পেলাম।

মুলুকচাঁদ হেসে জবাব দিল,—জুতোর বদলে যে তাজ ফিরিয়ে পাওয়া যায়—জীবনে আজ তা' প্রথম হোল।

বউটিও কম চালাক নয়। সে বল্‌ল,—জুতার তলার লেজটুকু বাদ দিয়ে উল্টালেই যে তাজ হয়, এটা বুঝি তুমি এতদিন জান্‌তে না?

মুলুকচাঁদ বউয়ের ছোট্ট হাতটি ধরে বল্‌ল,—সত্যি তুমি আমার মাথার তাজ—সাত সাগরের সেঁচা মাণিক! চিরকাল মাণিক হ'য়েই তুমি আমার ঘরে বিরাজ কর।

কলিকাতা
১৩৩৪

কেনারাম

কেনারাম

লোকটি ছিল বেজায় টাকার কুমীর। কুমীরের টাকা-কড়ির তো খোঁজ রাখি না, তবে লহনার কারবারে লোকটির এম্নি শক্ত 'খাই' ছিল যে, কুমীর যেমন খাঁজকাটা দাঁতে শিকার চিবিয়ে ধরে তেম্নি অনেকের সর্ব্বনাশ ক'রে সে-ও ঢের টাকাকড়ির মালিক হয়েছিল। তা' হ'লে কি হয়! ছেলেটি হোল তার এম্নি 'উড়নচণ্ডী' যে, বাপ মারা যাবার দু'বছরের ভিতর সেই সব উড়িয়ে দিয়ে ব্যস!—একেবারে ফতুর হয়ে বসলো। দুবেলা তখন তার খাওয়া জোটে না। সকাল বেলা তার বাপের নাম করলে নাকি উনুনের হাঁড়ি ফেসে চৌচির হ'তো, কাজেই ছেলের শেষটায় এম্নি দুর্দ্দশা হলো যে তার নিজের উনুনেই হাঁড়ি আর চড়ে না।

বেগতিক দেখে ছেলে তো জঙ্গলে গিয়ে এক গাছতলায়

গাছে ছিল এক ব্রহ্মদৈত্য

আশ্রয় নিল। সেই গাছে ছিল এক ব্রহ্মদৈত্যি। সে দেখ্‌লো, গাছতলার এই লোকটির রান্নাবান্না মোটে নেই, কেবল দিনরাত উপরের দিকে তাকিয়ে কি ভাবে! শেষটায় কি আমারই ঘাড়ে চাপ্‌বার ওর মতলব? সময় থাক্‌তে এর একটা বিহিত করা ভাল। মরে একপক্ষে তো বেশ নিশ্চিন্ত ছিলুম। এখন এই লোকটির মতই যদি কোনো দুর্ভাবনা আমার মাথায় ঢোকে—দুদিনেই তবে মারা পড়বো। মরে তো অনেককাল ভূত হয়েই আছি, ফের যদি মরি তবে আবার কোন্‌ ফ্যাসাদে ঠেক্‌বো ঠিক কি! এই ভেবে সেই গাছ থেকে নেবে এসে এক বুড়ো ব্রাহ্মণের বেশ ধরে সেই লোকটির কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলো,—হাঁরে, তুই এখানে বসে বসে কি ভাবিস্‌ বলতো? তোর বাড়ী ঘর কোথায়?

লোকটি জবাব দিল,—ঠাকুর, আকাশ পাতাল কত কি ভাবি,—সে কথা ব'লে আর কাজ কি? বাড়ী ঘর আমার কোথাও নেই। সম্প্রতি এই গাছতলায় বসে একটা সিদ্ধি-টিদ্ধির মতলব কচ্ছি।

"হাঁরে, ভূতটূত সিদ্ধি নয় তো?"

লোকটি উত্তর করলো,—ভূত হোক, প্রেত হোক,

দৈত্য হোক, দানা হোক, তার চৌদ্দ পুরুষ কাউকে বাদ দিচ্ছি না।

ব্রহ্মদৈত্যের মনে ভয় হোল, আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলো,—তুই কি চাস্ বল্‌তো ?

লোকটি বল্‌ল,—ঠাকুর, টাকাকড়ি হীরা জহরৎ, মণি মুক্তা, পরশপাথর।

ব্রহ্মদৈত্য একটু আশ্বস্ত হয়ে বল্‌ল,—তবে উপরে ঐ গাছটার দিকে অষ্টপ্রহর চেয়ে থাকিস কেন বলতো ? গাছের আগায় কি তোর টাকাকড়ি হীরে জহরৎ কোথাও লুকান আছে ?

লোকটি বলল,—ঠাকুর, গাছের আগায় কি বল্‌চো, কপালে থাকলে ঐ আকাশ ফুটো হয়ে হীরে জহরৎ গড়িয়ে পড়তে কতক্ষণ !

ব্রহ্মদৈত্যের মনের ভয় এবার অনেকটা কাট্‌লো। সে জিজ্ঞাসা করলো,—আচ্ছা তোর নাম কি বলতো ?

ঠাকুর, আমার নাম কেনারাম—আমি হোলেম গিয়ে কেবলরামের দৌহিত্র, আমার বাপের নাম নিধিরাম চক্কোত্তী।

'নেধে চক্কোত্তীর ছেলে তুই ?

ব্রহ্মদৈত্য বল্‌লে,—আরে থাম্‌ থাম। নিধে চক্কোর্ত্তীর ছেলে তুই? আমরা যে ইদানিং একসঙ্গে

কেনারাম বল্‌লে,—ঠাকুর, আমার বাবার যে কাল হয়েছে পূরা দুই বচ্ছর।

ব্রহ্মদৈত্য তাড়াতাড়ি বল্‌লে,—হ্যাঁ হ্যাঁ, ইদানিং এক-সঙ্গে—বহুকাল সাক্ষাৎ হয়নি'—বুঝলি? তোকে না হ'লেও তোর বাপ ঠাকুর্দ্দাকে খুবই চিনতুম। তা' তোর এই অবস্থা! তুই এক কাজ কর, দূরদেশে কোথাও গিয়ে একটা ব্যবসা বাণিজ্য কর, কপাল ফেরে তো একেবারে রাজা হয়ে বস্‌বি।

কেনারাম জবাব দিল,—ঠাকুর; মুখের কথার তো আর ট্যাক্স নেই—বল্‌লেই হোল। এদিকে যে ট্যাঁকে একটিও পয়সা নেই—তার উপায় কি? তুমি তো ব্যবসা বাণিজ্য ক'রে রাজা হবার পরামর্শটা দিয়ে ফেল্‌লে!

ব্রহ্মদৈত্য বল্‌লে,—আচ্ছা, তার একটা উপায় আমি ক'রে দিচ্ছি; কিন্তু সাবধান, ভুলেও এ জায়গায় আর কখনো আসিস্‌ না।

কেনারাম উত্তর করলো,—ঠাকুর, একবার দূরদেশে যেতে পারলে কি আর এ মুলুকে পা দেই?

ব্রহ্মদৈত্য মনে মনে খুসী হয়ে বল্‌লে,—লোকটা এখান থেকে বিদায় হলেই যে বাঁচি। কেবলরামের দৌহিত্র—সোজা পাত্র তো মোটেই নয়! প্রকাশ্যে বল্‌লে,—আচ্ছা, কাল সকাল বেলা ঐ এঁদো পুকুরটার ধারে একটা দড়ি কুড়িয়ে পাবি, তাতে একটা ফাঁস জড়ানো আছে। সেটা ধরে তুই যেখানে যেতে ইচ্ছা করবি, সেখানে গিয়েই হাজির হবি।

কেনারাম বল্‌লে,—দেখো ঠাকুর, তোমার কথা যদি সত্য না হয়, তবে দড়ির ফাঁসটা উল্টে তোমাব গলায়ই জড়িয়ে দেবো সেটা মনে রেখো।

ব্রহ্মদৈত্য বল্‌লে,—যা বল্‌ছি খুব সত্যি : বুড়ো ব্রাহ্মণের কথা কি কখনো মিথ্যে হয় রে?

কেনারাম জবাব দিল,—আচ্ছা, সে কাল বোঝা যাবে।

দুই

পরদিন সকাল বেলা এঁদো পুকুরের ধারে কেনারাম একটা দড়ি কুড়িয়ে পেয়ে তো মহাখুসী : সত্যি তা'তে একটা ফাঁস্ও জড়ানো ছিল।

কেনারাম প্রথমেই ভাব্‌লো, কোথায় যাই ? এমন জায়গায় যেতে হবে যেখানে চেনা লোকের টিকিটি পর্য্যন্ত দেখা না যায়। অনেক ভেবে চিন্তে স্থির করলো, মণিপুর জায়গাটি নেহাৎ মন্দ নয় ; দেশের কাছেও বটে, আর চেনা শোনা লোকও সেখানে নেই।

দড়ি ছুঁয়ে এই কথা ভাব্‌তেই বোঁ বোঁ ক'রে কেনারাম আকাশে উঠে পড়লো : দড়িখানা আরো শক্ত ক'রে ধরে রইলো ; তারপর অনেক পাহাড় পর্ব্বত ডিঙ্গিয়ে সে একেবারে মণিপুরে এসে হাজির হোল।

কেনারাম ভাবলে,—তাইতো ! বামুণ ঠাকুর আমাকে শুধু একগাছি দড়ি দিয়ে ভারি ঠকিয়ে গেল ! তার কাছে আরো কিছু চেয়ে নিলেই তো ছিল ভাল। যাক্, এখন

উপস্থিত যা হাতের কাছে পেয়েছি, তা' দিয়েই ভাগ্যটা একবার পরখ ক'রে নেওয়া যাক। কথায় বলে ফাউ পেলে আল্‌পিনটাও ফেলে যেতে নাই—সময়ে তা'ও অনেক কাজে লাগ্‌তে পারে।

কেনারাম প্রথমেই সহর দেখতে বের হোল। সহরের এক জায়গায় রাস্তায় বেজায় ভিড়,—রাস্তার দু পাশে কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়ে আছে।

কেনারাম একজনকে জিজ্ঞাসা করলো,—ওখানে কি ভাই? এত ভিড় কেন?

লোকটি জবাব দিল,—কোথাকার আহাম্মুক রে। ভিড় ক'রে বল্‌ছে এত ভিড় কেন?

কেনারাম বল্‌ল,—ভিড় করেছি বলেই ওখানে কি হবে জান্‌বো কি ক'রে বাপু?

লোকটি বল্‌ল,—তুমি তো আচ্ছা লোক; এই বল্‌লে ভাই, আবার বল্‌লে বাপু! তোমার কোন্‌টা যে ঠিক, তা' কি ক'রে বুঝবো? তুমি যে আমার সঙ্গে গোড়াতেই একটা গোল পাকিয়ে তুল্‌লে! তোমার মতলবটা কি?

কেনারাম বল্‌লে,—আরে দাদা চট কেন?

হাতীর উপরে রাজকন্যা মণিমালা

লোকটি রেগে বল্‌লে,—তুমি ত' আচ্ছা লোক হে—এই ভাই, বাপু তারপর দাদা—উল্টা পাল্টা কত কি ব'লে যাচ্ছ —এরপর শালা বল্‌তে কতক্ষণ ? অতগুলি পটাপট যখন ব'লে ফেলেছ, তখন শালা বলাটাই কি আর বাদ রইলো ?

কেনারাম তো মারের ভয়ে বেগতিক দেখে তাড়াতাড়ি ভিড়ের ভিতর লুকিয়ে পড়লো।

সাম্‌নে এগিয়ে এসে কেনারাম দেখলো, হাতীর উপর সোনার হাওদায় কিংখাপের পুরু গদির উপর রাজকন্যা মণিমালা বসেছে, পাশে বারো জন দাসী হাতীর দাঁতের পঙ্খের কাজকরা পাখায় রাজকুমারীকে বাতাস কচ্ছে।

রাজকুমারী যে সুন্দরী সেতো সবাই জানে। কেনারামের তো দেখে তাক্ লেগে গেল ! ভাবলে, উঃ ! বামুন ঠাকুর আমায় কি ঠকানটাই ঠকিয়েছে ! এই দড়ির বদলে রাজ-কুমারীকে চেয়ে নিলেই তো হ'তো ঠিক। যাক্,—এখন দেখা যাক, উপস্থিত বুদ্ধিটা কতটা কাজে লাগে।

তিন

এদিকে কেনারামের দড়িও চুপ ক'রে বসে ছিল না। সন্ধ্যাবেলা কেনারামের হুকুম হোল,—যাওতো, কোনো ময়রার দোকান থেকে এক হাঁড়ি রাবড়ি, এক হাঁড়ি সন্দেশ, এক হাঁড়ি কচুরি, এক হাঁড়ি জিবে-গজা ঝুলিয়ে নিয়ে এসতো?

অম্নি আর কথা নেই! ফাঁসটি তো দড়িতে জড়ানই ছিল; হাঁড়ির চারিদিকে সেই ফাঁসটি জড়িয়ে হাঁড়িটিকে শূন্যে চড়িয়ে একেবারে কেনারামের সম্মুখে এনে হাজির!

কেনারাম তো মজা ক'রে রোজ এই ভাবে রাবড়ি সন্দেশ খেতে লাগ্‌লো। কেবল কি তাই? জামার দোকান থেকে জামা, জুতার দোকান থেকে জুতা, গয়লার বাড়ী থেকে ক্ষীর মাখন, ফলের দোকান থেকে বস্তাভরা পেস্তা, বাদাম, আঙুর, আলুবখ্‌রা, কিস্‌মিস-মনাক্কা আস্‌তে লাগ্‌লো।

কেনারাম কেবল এতেও সন্তুষ্ট হোল না; রোজ রোজ তার মনে নানারূপ ফন্দি জুটলো।

একদিন রাজবাড়ীর লোকেরা দেখে, রাজার সখের ঘোড়াটা তালগাছের আগায় ঝুলছে। তালগাছ কেটে সেটাকে নাবাতে গিয়ে চার পা ভেঙ্গে তার তো ইস্তফা হ'ল। দিন-কয়েক বাদে রাজার শ্বেত হস্তীটি রাজবাড়ীর ছাদের উপর চড়ে বসেছে!

সবই কেনারামের দড়ির কাণ্ড! রাজ্যে এমন উৎপাত তো আর কোন দিন ঘটে নাই। রাজা দৈবজ্ঞ ডাকালেন, ঢের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ডেকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করলেন;—কিছুতেই কিছু হ'ল না। এখন উপায়? রাজা ভয়ে ঘর থেকে বের হ'ন না—কি জানি কখন কি বিপদ ঘটে!

মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে রাজা রাজ্যময় ঘোষণা দিলেন,—রাজ্যের এই উৎপাত যে বন্ধ ক'রে দিতে পারবে তাকেই রাজ্যের প্রধান কোতোয়াল করবো।

কেনারাম তো সেলাম ঠুকে রাজ-দরবারে এসে হাজির হ'ল।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন,—তুমি এসব বন্ধ ক'রে দিতে পারবে?

কেনারাম উত্তর দিল—হুজুর, আমার কাজেই তা প্রমাণ পাবেন; তিন দিনের ভিতর আমি সব ঠিক ক'রে নিব।

কেনারাম প্রধান কোতোয়াল হবার পর থেকে রাজ্যে এসব আর কোন উৎপাত নেই ;—এমন কি চুরি ডাকাতি পর্য্যন্ত একেবারে বন্ধ ! চুরি ক'রে মাল কোথাও লুকিয়ে রাখলে কেনারাম মাল-সমেত চোর এনে রাজ-দরবারে হাজির করে।—কেউ কোথাও লুকিয়ে পালিয়ে রক্ষা পাবে তারও উপায় নেই !

কেনারামের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে রাজ-দরবারে জয়-জয়কার পড়ে গেল।

কোতোয়াল হ'য়ে কেনারামের প্রতাপ চারিদিকেই বেড়ে গেল। এখন আর তাকে ময়রার বাড়ী থেকে মিষ্টান্নের হাঁড়ি, গয়লার বাড়ী থেকে ক্ষীর মাখন, দড়িতে ঝুলিয়ে আনতে হয় না। লোকেরা সব ভাল ভাল জিনিষ কোতোয়াল সাহেবকে 'নজর' সমেত ভেট দিয়ে যায়। কোতোয়াল সাহেবের খাতির স্বয়ং রাজা পর্য্যন্ত করেন—অন্য লোকের তো কথাই নেই।

কলিকাতা
১৩৩৪

তিনকড়ির ডায়েরী

তিনকড়ির ডায়েরী

মধুপুর, শনিবার

১লা আষাঢ়

এই সবে বর্ষার সুরু। গ্রীষ্মের ছুটিটা কি-বারেই যেন লাফ মেরে তাড়াতাড়ি ফতুর হয়ে সরে পড়ে!—এবারেও তাই,—ইস্কুল খোলবার তারিখ এই সাতাশে—

খেলার পাকাগুটি কাঁচা হাতে ভেস্তে গেলে দিনটা যেমি আপশোষে কাটে—পাকা আমের ফাঁকা ঝুড়িটা বয়ে নে-যাবার মতো বাকি আমোদ-প্রমোদের দিনগুলিও তেমি ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে!

তিনকড়ি ঘরের বারেন্দায় দাঁড়িয়ে বাইরের বৃষ্টির দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। বৃষ্টির ফোঁটা ছাদ থেকে গড়িয়ে লাফিয়ে ঝাপিয়ে মাটিতে পড়েই ব্যস!—দুষ্টু ছেলের মতো ধূলো কাদায় নোংরা হচ্ছে।

তিনকড়ি ভাব্‌লো, ইস্কুলে এমনটি হোলে মাষ্টার মশায় এখুনি ছাত্রদের কান ধরে বেঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে দিতেন।

হঠাৎ একটা কোলা বেঙ সাপের মুখ থেকে কোনক্রমে কক্ষে এসে বেড়া ডিঙ্গিয়ে একেবারে সিড়ির উপর উঠে পড়লো। তারপর ট্যাবা ট্যাবা চোখ দুটা পাকিয়ে তিনকড়ির মুখের দিকে একেবারে হাঁ হয়ে তাকিয়ে রইলো,— যেন তিনকড়ির মনের কথাগুলো সবই সে বুঝতে পাচ্ছে! তার সেই ভাবখানা দেখে তিনকড়ি না হেসে আর থাক্‌তে পারলো না।

বেঙটা খানিক চুপ থেকে গলা ফুলিয়ে ডাক্‌তে সুরু করলো।—কো-কো-কোরাং-কোরাং।

তিনকড়ি ভাবলো,—কি আপদ!—এর আবার হোল কি?

তিনকড়ির মনের কথাটা বুঝেই যেন বেঙটা আবার লাফাতে সুরু করলো।

তিনকড়ি মনে মনে ভাব্‌লো,—উঃ! কি বাহাদুরীটাই দেখালো যেন।

বেঙটা রেগে কট্‌মট্‌ ক'রে তিনকড়ির দিকে তাকিয়ে

বলে উঠলো,—বাহাদুরী বই কি! তোমাদের 'লিপ্‌ফ্রগ' খেলা —সেতো আমাদের কাছেই শেখা; সেটা অস্বীকার করতে পার কি?

—কো-কো-কোরাৎ-কোরাৎ।

তিনকড়ি মনে মনে জবাব দিল,—সে খেলা আমার মোটেই ভাল লাগে না।

বেঙ জবাব দিল,—তোমার ভাল লাগা না লাগার কথা হচ্ছে না। তবে একটা গল্প বলি শোন;—

একবার একদল ছেলে কোথা থেকে 'লিপফ্রগ' খেলা শিখে এসেছে; খাওয়া নেই—নাওয়া নেই, লেখা নেই—পড়া নেই, রাতদিন কেবল তাদের এই খেলা—খেলা। বাপ মা অনেক বারণ কল্লেন—ভাই বোনদের নিষেধও তারা মানলে না। শেষটায় ইস্কুলে মাষ্টার মশায় ছেলেদের কান ধরে বেঞ্চের তলায় বেঙ ক'রে বসিয়ে রাখলেন। ভবিষ্যতে যদি কখনো এই খেলা খেলে, তবে তাদের আচ্ছা রকম সাজা হবে ব'লে ভয়ও দেখালেন। তবু সেই খেলার ঝোঁক ছেলেদের কাটলো না। তারা একদিন নদীর ধারে গিয়ে লুকিয়ে আবার সেই খেলা সুরু করলো। সেই খেলাটা কি রকম

ছেলেদের লিপ ফ্রগ খেলা

জান ? একদল ছেলে প্রথমে সার বেঁধে মাজাভাঙ্গা দ হয়ে হাত ঝুলিয়ে ঘাড় গুঁজে দাঁড়ায় ; বাকি ছেলেরা পিছন থেকে এসে একজন অপর জনের ঘাড়ের উপর দিয়ে লাফিয়ে গিয়ে পূর্ব্বের মত সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে। তখন পিছনের ছেলেগুলিও পুনরায় সাম্‌নের ছেলেগুলির ঘাড়ের উপর দিয়ে লাফাতে থাকে।

সেদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা সেই ছেলেরা কেবল এই খেলায়ই মেতে রইলো। আস্তে আস্তে তাদের মাথা থেকে সুরু ক'রে হাত পা অবধি বেঙের মত চ্যাপ্টা হয়ে উঠলো। শেষটায় তাদের সমস্ত শরীরটা বদলে ঠিক বেঙের মতো হোল এবং কো-ক্কো-কোরাৎ-কোরাৎ ক'রে একে অন্যের ঘাড়ের উপর দিয়ে লাফিয়ে ঝুপ্ ক'রে জলে পড়তে লাগ্‌লো।

তিনকড়ি গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলো,—আচ্ছা, পরে সেই ছেলেদের কি হোল ?

বেঙ জবাব দিল,—কেন, বেঙ হয়ে তারা জলেই রয়ে গেল।

তিনকড়ি জিজ্ঞাসা করলো,—এখনো তারা সেই খেলা ছাড়তে পারে নি বুঝি ?

ছেলেরা লিগফ্রগ খেলতে খেলতে শেষটায়—

বেঙ জবাব দিল,—ছেড়েছে বই কি! কিন্তু সেই খেলার দরুণ চিরকালই এই সাজাটা তাদের পেতে হচ্ছে।

তিনকড়ি বল্‌লো,—তাদের তুমি দেখেছ?

বেঙ উত্তর দিল,—দেখেছি বই কি? আমাকে দেখে তোমার কি মনে হয়?

তিনকড়ি বল্‌লো, কেন, বেঙ।

বেঙ হেসে জবাব দিল,—সেটা তো অতি সোজা কথা। বাইরে আমায় দেখ্‌চো বটে বেঙ, কিন্তু ভেতরটা যদি দেখ্‌তে পেতে তবে বুঝতে, আমি সেই ছেলেদেরই একজন ছিলুম।

তিনকড়ি বল্‌লো,—তাই নাকি! তবে বাড়ী ফিরে যাওনা কেন?

বেঙ উত্তর দিল,—বাড়ীতে গেলে কি আমাকে কেউ চিন্‌তে পারবে—না, বল্‌লে বিশ্বেস করবে?

তিনকড়ি উত্তর দিল,—তাতো বটেই! এখনো সেই 'লিপ্ ফ্রগ' খেলা তোমার ভাল লাগে?

বেঙ বলে উঠলো,—আরে রাম! সে কি আর ভাল লাগে? সেই খেলার জন্যই তো এই শাস্তি ভোগ। আচ্ছা, ইস্কুলে যেতে তোমায় ভাল লাগে?

তিনকড়ি উত্তর দিল,—সেটা বলা শক্ত; তবে ছুটি ছাটা পেলে ভারি আমোদ হয় বটে;—কেননা, তখন যত খুসী খেলে বেড়িয়ে কাটালেও কেউ কিছু একটা বলে না।

বেঙ বল্‌লো,—আচ্ছা, ইস্কুলে গিয়ে লেখাপড়া শিখে তো লোক বিদ্বান হয়;—তবে সেটা তোমার ভাল লাগে না কেন? বই পড়লে জ্ঞান জন্মে—কত ভাল ভাল বিষয় তাতে শেখা যায়। তবু লেখাপড়াটা তোমার কাছে ভাল লাগে না কেন?

তিনকড়ি এইবার রেগে বল্‌ল—তবু তো আমরা ইস্কুলে যাই, লেখাপড়া শিখি—অবশ্য যতটা পারি। তোমরা তো শুধু লাফিয়েই বেড়াও।

বেঙ উত্তর দিল,—শুধু লাফিয়ে বেড়াই?—সেটা তোমার ভুল। দেখ, কথা বল্‌বার আগে একটু ভেবে বলাই উচিত, নইলে তোমাদের অনেক কথারই হ্যাঁ—না, কিছুই ঠিক বোঝা যায় না। দেখ, পাকা কথার মতো কথা নেই, যেমন পাকা সোণার মানেই হোল খাঁটি সোণা। তারপর বিয়ের সময়ে পাকা দেখার তো কথাই নেই। কিন্তু "পাকা কলা খাবে? কথাটা মানুষকে না ব'লে বানরকে বল্লেই

শোনায় ভাল। তেম্নি কাঁচ্‌কলা দেখানোটাও ভারি অভদ্রতা। কাঁচ্‌কলা করবে—মানে, কিছুই করতে পারবে না।

তারপর পাকা শশার চেয়ে কচি শশাই অনেকে পছন্দ করেন। তেম্নি গুড়ের চেয়ে আঁকের কাঁচা রসটাই নাকি বেশী উপকারী। কিন্তু বুদ্ধির ব্যাপারে পাকাচুলের আদর সর্ব্বত্র। লোকটা কাজে পাকা,—কাজেই সকলেই তার সুখ্যাত করে। পাকা দাঁতে চিবুতে কিছুই কষ্ট হয় না; দুধের কচি দাঁত পড়ে গিয়েই লোকের পাকা দাঁত গজায়। পাক্কি সের, আর কাচ্চি সেরে যে কি তফাৎ তাতো জানই। কাচ্চির একসের দুধে পাক্কি সেরের তিনপো' দাঁড়ায়। সেজন্য গোয়ালারা প্রায়ই পাক্কির নাম ক'রে কাচ্চি চালিয়ে বেশ দু' পয়সা ঠকিয়ে নেয়।

তিনকড়ি রেগে বল্‌লো,—তোমার কাচ্চি পাক্কির গোল থামিয়ে আসল কথাটা এখন বলে ফেল্লেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।

বেঙটা খানিক চুপ ক'রে শেষটায় বল্‌লো,—রাগ কর্ল্লে বুঝি?—তবে বলি, আমরা শুধু লাফাই—এটা কোন কাজের কথা নয়;—সময় পেলেই আমরা বাঁশী বাজাই এবং

বেঙ হয়েই তারা জলেই রয়ে গেল

আরো ঢের কাজ করি। আমাদের বাঁশী বাজানো একটু শুন্‌বে কি?

কো কো কোরাং—না, ঘোঙ্‌ ঘোঙর ঘ্যাং কোনটা?

তিনকড়ি উত্তর দিল,—না, এখন সব কটাই থাক।

বেঙ ব'লে উঠলো,—সেই ছড়াটা—

বেঙের গলায় কণ্ঠমালা
বেঙে বাজায় বাঁশী;
গোক্ষুর খরিস্ লাঙুল নাড়ে
গর্ত্তের ভিতর বসি।

হাঁ, দিনের বেলা বাঁশীটা তেমন জম্‌বে না। রাতের বেলা দলের সবাই মিলে বরং তোমাদের বাগানের চৌবাচ্চার ভিতর বাঁশী বাজাবো। তোমাদের সানাই বাজ্‌না আমাদের সঙ্গে কিছুতেই পাল্লা দিয়ে উঠতে পারবে না।

তিনকড়ি বিরক্ত হয়ে বল্‌লে,—তোমাদের বাজ্‌নার জন্য আজ রাত্রিবেলা আর ঘুমুতে পারবো না দেখ্‌চি।

বেঙ আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লে,—সেকি! এমন বৃষ্টির দিনে আমরা তো মোটেই ঘুমুই না।

তিনকড়ি বল্‌লো,—তবে তোমরা কখন ঘুমাও?

বেঙ উত্তর দিল,--কুম্ভকর্ণের নাম শুনেছ তো? যিনি ছ'টা মাস কেবল ঘুমিয়েই কাটাতেন—আর বাকি ছটা মাস থাক্তেন জেগে। সে বিদ্যেটা তার আমাদের কাছেই শেখা। শীতের দিনে আমরা সকলে মিলে গর্ত্তের ভিতর ছ' মাস কেমন আরামে ঘুমিয়ে থাকি। সারা শীতকালটা আমাদের ঘুমের ভিতরই কেটে যায়। গ্রীষ্মকালের রৌদ্রে মাটি তেতে উঠলে আমরা জেগে উঠি। তারপর বর্ষাকালে আমাদের ঢের কাজ কর্ম্ম সুরু হয়। সেই সময়ে আমরা ঘর দোর ছেড়ে হাওয়া খেতে বের হই। তোমরা যেমন মধুপুর জামতারা বেড়াতে যাও—ঠিক তেম্নি। তখন আমাদের বাচ্চা জন্মায়। প্রথমে সেগুলি ছোট্ট একটি তিলের মত জলের উপর ভাস্তে থাকে। দু' দিনের ভিতর সেগুলি বেশ বড় হয়ে উঠে এবং ওদের লেজ গজায়। সেগুলি হোল বেঙাচি। তখন জলের মাছ ও নানা রকম পোকা মাকড় সেগুলি পেলেই গিলে ফেলে। সেজন্য আমরা তাড়াতাড়ি সেগুলিকে মুখে ক'রে নিয়ে অন্যত্র লুকিয়ে রাখি। কয়েক মাস পরে বেঙাচির লেজ খঁসে গেলেই সেগুলি জল থেকে লাফিয়ে ডাঙায় ওঠে। তবেই বুঝলে, আমাদের জাতটা

জলের মাছ ও পোকা মাকড় সেগুলি পেলেই গিলে ফেলে

নেহাৎ ছোট নয়। দুবার আমাদের খোলস বদ্‌লে যায়, সেজন্য আমরা হোলেম দ্বিজ। আমাদের জাতের ভিতর নীলা বেঙ, কোলা বেঙ, ঢোড়া বেঙ, পাতি বেঙ, গেছো বেঙ—অনেক জাতের বেঙ দেখ্‌তে পাবে।

দুই

এমন সময় গর্ত্তের ভিতর থেকে একটা ইঁদুর উঁকি দিতেই বেঙ মশায় চক্ষু বুজে ঝুপ্ ক'রে জলে লাফিয়ে পড়েই ডুব মারলো।

ইঁদুরটা আস্তে আস্তে গর্ত্তের বাইরে এসে লেজ দোলাতে লাগলো; তারপর আধখানা চোখ বুজে গোঁফ দোলাতে সুরু করলো।

তিনকড়ি মনে মনে ভাব্‌লো—কি রকম বেয়াড়া মূর্খ কোথাকার?

ইঁদুরটা তিনকড়ির দিকে তাকিয়ে বল্‌লো,—ভাব্‌চো, লেখাপড়া কিছু শিখিনি বুঝি?

তিনকড়ি মনে মনে বল্‌লো,—লেখাপড়া ছাই! দুটো অক্ষর অবধি শেখ নি'।

লেজটা পিছনের দিকে বাঁকিয়ে ইঁদুরটা বল্‌লো,—কি হোল বল দেখিন?

তিনকড়ি উত্তর দিল,—শুধু একটা ৎ।

লেজটা উল্টে পিছনে ঠেকিয়ে ইঁদুরটা বল্‌লো,—এবার ?

তিনকড়ি উত্তর দিল,—শূন্য।

ইঁদুরটা বল্‌লো,—আচ্ছা, দুটো ৎ একত্র জোড়া দিলে কি হয় বলতো ?

তিনকড়ি উত্তর দিল,—ব্র্যাকেট বা বন্ধনী-চিহ্ন।

ইঁদুরটা পুনবায় বল্‌লো,—দুটো ৎ যদি একত্র পাশাপাশি জুড়ে ফেলি তা' হোলে কি হয় বল দেখিন ?

তিনকড়ি ভাব্‌তে লাগলো।

তখন আর একটা ইঁদুর পিছন থেকে এসে পূর্ব্বের ইঁদুরটার লেজে লেজ ঝুলিয়ে বস্‌লো।

তখন আর একটা ইঁদুর পিছন থেকে এসে পূর্ব্বের ইঁদুরটার গায় লেজ ঝুলিয়ে বস্‌লো

তিনকড়ি চেয়ে দেখ্‌লো ; তারপর ব'লে ফেল্‌লো,—চার।

ইঁদুরটা বল্‌লে,—আর ইংরাজীতে হয় আট। তুমি যে বড় বল্‌ছিলে আখর অবধি শিখিনি—এইবার তার কিছু পরিচয় পেলে তো ?

হঠাৎ একটা পেঁচা ঝোঁপ থেকে বেরুয়ে শোঁ ক'রে উড়ে আস্‌তেই ইঁদুর দুটা ভয়ে জড়াজড়ি হয়ে বেড়া ডিঙ্গিয়ে একেবারে গর্ত্তের ভিতর ঢুকে পড়লো ; এবং ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে পেঁচার মুখখানি দেখ্‌তে লাগলো।

পেঁচাটা পাখা ঝেড়ে বারেন্দায় রেলিংয়ের উপর এসে বস্‌লো।

পেঁচার মস্ত চোখ দুটার দিকে তাকিয়ে তিনকড়ির যেন কেমন ভয় ভয় করতে লাগ্‌লো। পড়া না শিখে ইস্কুলে গেলে মাষ্টার মশায়ের দিকে তাকিয়ে ঠিক এম্নি ভয় হয়। পেঁচা ঘাড় কাৎ ক'রে তিনকড়িকে বার বার দেখ্‌তে লাগলো।

তিনকড়ির মনে হোল, পেচার কানের কাছে যেন দুটো পাখের কলম গোঁজা রয়েছে !

পেঁচা গম্ভীর ভাবে বল্‌লো,—পড়াশোনা কিছু শিখেছ ?

তিনকড়ি ভয়ে ভয়ে বল্‌ল,—না।

পেঁচা বল্‌ল,—'হুতোম পেঁচার নক্সা' বইখানা পড়েছ ?

তিনকড়ি উত্তর দিল—না।

পেঁচা জিজ্ঞাসা করলো,—ওতে আমাদের গালাগালি দিয়ে কিছু লিখেছে জান ?

তিনকড়ি বল্‌ল,—কই শুনিনি।

পেঁচা বল্‌ল,—তোমরা বই লিখে গালাগালি দিতে খুবই পটু ;—সেটা তোমাদের একটা মস্ত বড় অস্ত্র। হয় গালা-গালি—নয় কান্না, এ দুটাই তোমরা জান ভাল। আমাদের দেশে কখনো গেছিলে ?

তিনকড়ি বল্‌ল,—আমি তো কাউকে কখনো গালাগালি দেই না—আর তোমাদের দেশে কখনো আমার যাওয়া হয় নি।

পেঁচা গম্ভীর হয়ে বল্‌ল,—যাক, তোমাকে অতটা খারাপ ব'লে মনে হয় না। যদি কখনো আমাদের দেশে যেতে, তবে কাউকে গালাগালি দিয়ে কখনো বই লিখ্‌তে না। তোমাদের সকলের চেয়ে আমাদের দেখ্‌বার ক্ষমতা ঢের বেশী। রাত্রি বেলা অন্ধকারে দু মাইল দূর থেকেও আমরা মাটির উপর জিনিষপত্র স্পষ্ট দেখ্‌তে পাই। সেজন্য আমাদের চোখ দুটা বড়—কিন্তু বড় কাজের। ইঁদুরগুলি গর্ত্তের ভিতর

থেকে বের হয়ে যখন মজা ক'রে নাচ্ সুরু করে, তখন আমরা অন্ধকারে শোঁ ক'রে এসে ওদের কান ধরে নিয়ে যাই। রোজ ২০।২৫টা ইঁদুর না হোলে আমাদের বাচ্চাদের খাওয়াই হয় না।

তিনকড়ি বললো,—তা' হোলে তোমরা রোজ ঢের ইঁদুর মেরে ফেল?

পেঁচা উত্তর দিল,—ইঁদুর না মেরে ফেল্লে তো তোমাদেরই সর্ব্বনাশ হোত,—গোলাবাড়ীর এবং মাঠের অর্দ্ধেক ধানই ওরা খেয়ে ফেল্‌তো। সে হিসেবে আমরা তোমাদের কত উপকারী বন্ধু। তবু তোমরা কালি-কলম পেলেই আমাদের নামে নানা কুৎসা রটাও এবং রাত্রিবেলা আমাদের আওয়াজ শুনতে পেলে তোমরা 'দূর দূর' ক'রে তাড়াও। আমাদের লক্ষ্মী পেঁচাদের তো তোমরা খুবই আদর কর। কেননা ওরা মা লক্ষ্মীর বাহন; কিন্তু আমাদের চেহারা দেখ্‌লেই তোমাদের গা চর চর করে কেন?

তিনকড়ি উত্তর করলো,—প্রথমটা তোমাকে দেখে একটু ভয় হয়েছিল বই কি! কিন্তু এখন তা' মোটেই নেই। হঠাৎ কোন অপরিচিত লোকের কাছে গেলে বুকটা প্রথমে একটু

টিপ্ টিপ্ করে :—পরিচয় নেই বলেই সেটা হয়, আলাপ পরিচয় হোলে সেটা আর থাকে না। আচ্ছা, তোমাদের দেশ এখান থেকে ক'দ্দূরে ?

পেঁচা উত্তর দিল,—ঐ যে দূরে প্রকাণ্ড একটা অশ্বত্থ গাছ দেখ্ চো—যার ফাঁক দিয়ে চাঁদটা উঠ্ তেই তোমরা প্রথম দেখ্ তে পাও—সেখান্টায় আমি থাকি। সূর্য্য কিরণ মোটেই আমার ভাল লাগে না, সেজন্য দিনের বেলা গাছের কোটরে আমি ঘুমিয়ে কাটাই। সন্ধ্যা হোলেই মাঠে জঙ্গলে ঘুরে আমরা শিকার ক'রে বেড়াই।

তিন

তিনকড়ি হঠাৎ দেখ্‌তে পেল, তার পায়ের গোড়ালী ঘেঁসে একটা গিরগিটি ছুটে গিয়ে একটা গাছের ডালে বসে ক্রমাগত মাথা দোলাতে সুরু করেছে।

গিরগিটির জিভ নাড়ার রকম দেখে

গিরগিটির মাথা ও জিভ্‌নাড়ার রকম দেখে তিনকড়ি হেসে উঠলো।

পেঁচা ইত্যবসরে উড়ে চলে গেছে। গিরগিটিটা বার কতক মাথা দুলিয়ে তিনকড়ির দিকে চেয়ে বল্‌ল,—বড্ড হাসি দেখ্‌তে পাচ্ছি যে?

তিনকড়ি উত্তর দিল,—হাস্‌বো—নয়তো কি কাঁদবো?

তোমার এই ঢং দেখ্‌লে সবাইর হাসি পায়। ওটা তোমার কোন ব্যারাম নাকি?

গিরগিটিটা রেগে উত্তর দিল,—আমি এইমাত্র ছুটে গিয়ে তোমার পায়ের কাছের কাঁকড়া বিছেটা গিলে না ফেল্লে এখুনি তো তোমায় হুল ফুটিয়ে দিচ্ছিল আর কি! এই দেখনা, বিচ্ছুটা আমার পিঠে অন্ততঃ বিশবার হুল ফুটিয়েছে—তবু আমি তাকে গিলে সাবার করেছি। ওর একটা হুল তোমার পায়ে বিঁধলে তোমার এতো হাসি থাক্‌তো কোথায়—যাদু?

তিনকড়ি আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌ল,—তাইতো! তোমায় এতক্ষণ একটা ধন্যবাদ আমার দেওয়া উচিত ছিল; 'থ্যাঙ্ক ইউ সার।'

গিরগিটি উত্তর করলো,—ও কথাটার যে কি অর্থ, আমি ঠিক তা' বুঝেই উঠতে পারলুম না; আর, একটা ঠাং খাবার কথা বল্লে নাকি?

তিনকড়ি বল্‌ল,—তা' নয়; ওটা ইংরাজী কায়দায় তোমাকে ধন্যবাদ জানানো হোল।

গিরগিটি বল্‌ল,—তা যে রকম বিশ্রি ক'রে কথাটা বল্লে

তা' শুনতে মোটেই আমার ভাল লাগ্‌ছিল না। আজকাল তোমাদের হাল-ফ্যাসানের যে সকল কথাবার্ত্তা আমদানী হয়েছে, তাতে সেটা গালাগালি কি কোলাকোলি—বোঝাই শক্ত। এই তো "গুডমর্ণিং" ব'লে শেষটায় তোমরা যে রকম হাত-মচ্‌কানো রকমের কি একটা কসরৎ কর, সেটা আমাদের চোখে বড্ড বেখাপ্পা মনে হয়। শোনা যায়, কোনো কোনো দেশে নাকি পরস্পর দেখা হোলে এই হাত মচ্‌কানোর বদলে পরস্পরের নাক ঘস্‌তে হয়। পিপড়েরা নাকি পরস্পর নাক ঘসেই নিজেদের মনের কথাবার্ত্তা ব্যক্ত করে। কঙ্গারু প্রাণী নাকি পরস্পর লাথি মেরে আনন্দ প্রকাশ করে।

তোমাদের দেশের নমস্কার, প্রণাম ও আশীর্ব্বাদ—সেগুলি মামুলী ব'লে আজকাল উঠে যাচ্ছে। "নমস্কার দাদা-ঠাকুর" "প্রণাম খুড়ো-মশায়", "জয়স্তু" "কল্যাণস্তু"—এই কথা গুলিতে কেমন একটা শ্রদ্ধা, প্রীতি ও কল্যাণের ছাপ রয়েছে। তা' নয়, কোথাকার "ছাড়ুড়ু, ঠ্যাং খেও—কি বেঙ খেও" যত বিশ্রি কথার আমদানী হয়েছে। আসি তবে—নমস্কার।

গিরগিটিটা সুরুৎ ক'রে জঙ্গলের ভিতর ঢুকে পড়লো।

তিনকড়ি চেয়ে দেখ্‌লো, একটা টিক্‌টিকি দেয়ালের গায় কি যেন একটা লক্ষ্য ক'রে চুপ ক'রে বসে আছে।

তিনকড়ি বল্‌লো,—ওখানে তুমি কি কচ্ছ? টিক্‌টিকি মাথা নেড়ে বল্‌ল,—চুপ, ঐ যে একটা মশা দেয়ালের গায় বসেছে, এখুনি তার দফা নিকেশ কচ্ছি:—নয়তো রাত্রি বেলা ঘুমিয়ে থাক্‌লে ওরা গিয়ে তোমার রক্ত চুষে খাবে।

তিনকড়ি জিজ্ঞাসা করলো,—তুমি কি ঐ মশাগুলি খেয়ে ফেল? রোজ কতগুলি খাও?
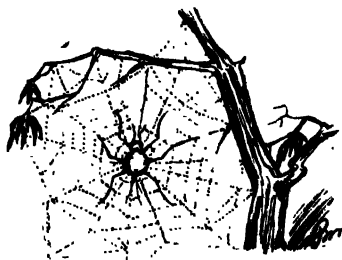
মাকড়শাগুলি বেশ বুদ্ধি ক'রে ঘরের আনাচে-কানাচে
জাল বুনে বসে থাকে

টিক্‌টিকি উত্তর করলো,—হাঁ; অন্ততঃ আড়াই-শো

মশার কমে আমাদের পেটই ভরে না ;—তাই বড্ড ছুটোছুটি ক'রে আমাকে রোজ এই খাবার সংগ্রহ করতে হয়। মাকড়শাগুলি বেশ বুদ্ধি ক'রে ঘরের আনাচে-কানাচে জাল বুনে বসে আছে। মশা সেদিকে এলেই জালে আট্‌কা পড়ে। সেই জালের ভিতর পড়লে মশার সাধ্য কি পালায়। মাকড়শা তখন জালের সুতো বেয়ে এসে সেই মশাটিকে গিলে আবার নিজের জায়গায় গিয়ে চুপ করে বসে থাকে। আর সর্ব্বদা আমাদের এখানে সেখানে মশার খোঁজে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াতে হয়।—একি কম পরিশ্রম!

তিনকড়ি বল্‌ল,—তাতো বটেই।

টিক্‌টিকি বল্‌ল,—আচ্ছা, তবে বন্ধু বিদায়।

তিনকড়ি বল্‌ল—নমস্কার বন্ধু।

টিক্‌টিক্‌ করতে করতে টিক্‌টিকিটা তাড়াতাড়ি চলে গেল।

চার

তিনকড়ি এইবার চেয়ে দেখ্‌লো, একটা সোনালী রঙের বোল্‌তা বারেন্দার আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে,—কেবল ভোঁ ভোঁ শব্দ—কোনদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নাই। এমন কি তিনকড়ির শরীরের পাশ কেটে চলে যাচ্ছে—তবু সেদিকে বোল্‌তার একটু লক্ষ্য নাই।

এবার বোল্‌তাটা পাশ কেটে উড়ে যেতেই তিনকড়ি বল্‌ল,—নমস্কার, ওহে, একটা কথাই শুনে যাও না।

বোল্‌তা বল্‌লে,—কথা শোনবার কি আমার আর সময় আছে ভাই।

বোল্‌তাটা এবার রেলিংএর ধারে এসে বসে পড়্‌লো

তিনকড়ি বল্‌লো,—বড্ড যে কাজের লোক। ঐ তো ভোঁ ভোঁ ক'রেই ঘুরে বেড়াচ্ছ—তা' আবার সময় হয় না! বোল্‌তাটা এবার রেলিংএর ধারে এসে বসে পড়লো; তারপর বল্‌লো,—বিনাকাজে ঘুরে বেড়ানো, সে একমাত্র তোমরাই পার—আমরা নই। রাতদিন দেখ্‌চো তো?—কেবল কাজ—কাজ নিয়েই ব্যস্ত আছি।

তিনকড়ি বল্‌লো,—ও রকম কাজ পেলে, কেবল রাত-দিন কেন—সারাটা বচ্ছরই ঘুরে বেড়াতে পারি।

বোল্‌তা উত্তর দিল,—আমাদের কাজটা কি তোমার কম মনে হোল?

তিনকড়ি বল্‌লো,—এমন কাজতো আমরা অজস্র করতে পারি!—হাওয়া খেয়ে ঘুরে বেড়ানো তো?

বোল্‌তা বল্‌লো,—বটে! এইতো সকাল থেকে সন্ধ্যা, এর ভিতর অন্ততঃ ৫।৭ শত মশা আমাকে মেরে সাবার করতে হবে—সেটা কি কম কাজ হোল?

তিনকড়ি বল্‌লো,—রোজ তোমাকে তাই করতে হয় বুঝি?

বোল্‌তা উত্তর দিল,—কাজ তো আমরা রোজই করি। তোমাদের মত দশ দিন কাজ, পাঁচ দিনই স্কুল কামাই,

শেষটায় দিন পনেরো ছুটি—এই তো তোমাদের কাজ। আর আমাদের কাজের ভিতর—তোমাদের কামাই ছুটি, ছুটোর একটাও নাই। সারা বছর ধরে কেবল কাজই করি, কেবল রাত্রিবেলা বিশ্রামের জন্য ঘুমিয়ে থাকি।

তিনকড়ি বল্‌লো,—সন্ধ্যাবেলাটা না হয় একটু জিরিয়ে আরাম করলে—তাতে আর দোষটা কি?

বোল্‌তা উত্তর দিল,—সন্ধ্যাবেলা আমাদের কাজের ভিড় সব চেয়ে বেশী: কেননা, মশাগুলি সে সময় বেরুতে সুরু করে। দিনের বেলা অন্ধকার ঘর ছাড়া তো ওদের খুঁজে পাওয়াই শক্ত;—কাজেই সন্ধ্যাবেলায় আমাদের কাজটা অত্যন্ত বেশী।

তিনকড়ি জিজ্ঞাসা করলো,—আচ্ছা, রাত্রিবেলা তোমরা থাকো কোথায়?

বোল্‌তা উত্তর দিল,—কেন, বাসায় ফিরে যাই; ঝড়-বাদলা কিম্বা বৃষ্টি-বাতাস হোলে এখানে-সেখানে এক জায়গায় রাতটা কাটিয়ে দেই।

তিনকড়ি জিজ্ঞাসা করলো,—বাসায় তোমার আর কে কে আছে?

বোল্‌তা বল্‌লো,—আমাদের বাসায় অনেক বোল্‌তা এক সঙ্গে থাকে। সেই বাসার নাম হোল চাক্‌। বোল্‌তা-রাণী হোলেন সেখানকার মালিক। আমরা হোলেম সকলে তাঁর প্রজা এবং চাকর বাকর। সারাবছর আমাদের খেটেই যেতে হয়;—এবং সকলে মিলে বোল্‌তা রাণীর আহার যোগাই। মোম্‌ কুড়িয়ে এনে আমরা চাক তৈরী করি। চাকের ভিতর ছোট ছোট কুকুর থাকে—তাতে বোল্‌তা রাণ অনেক ডিম পাড়ে। সেই ডিম ফুটে বাচ্চা হোলে কিছুদিন পরে তারাও আমাদের মতো কাজে লেগে যায়। তোমরা সময়সময় ঐ চাক্‌ ভেঙ্গে ডিম চুরি ক'রে, তা' বড়শীতে গেঁথে মাছ ধর। আমরা যেমন মাছি খেয়ে বেড়াই, তেম্নি এক শ্রেণীর মধুমক্ষিকা ফুলে ফুলে ঘুরে মধু সংগ্রহ করে। সেই মধু এতো মিষ্টি যে কি বল্‌বো! তোমরা সেই চাক্‌ ভাঙ্গবার সময় আগুন জ্বেলে মধুমক্ষিকাগুলিকেও পুড়িয়ে মারো। এমনি নির্দ্দয় তোমরা! শুধু মধু নিয়েও তোমরা খুসী হওনা—উপরন্তু এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড চালাও।

তিনকড়ি দুঃখিত হয়ে বল্‌ল,—সত্যি, এ বড়ই অন্যায়। এত কষ্ট ক'রে যারা মধু সঞ্চয় করে, মধুর লোভে সেই উপকারী

বন্ধুদের পুড়িয়ে মারা কেবল অন্যায় নয়—মহাপাপ। সত্যি, মানুষের এত উপকার ক'রেও তাদের হাতে তোমাদের দুর্গতির সীমা নেই। পেঁচা বল, অন্য পাখী বল, এমন কি টিক্‌টিকি গিরগিটি পর্য্যন্ত মানুষের উপকার কচ্ছে। শুনেছি, দোয়েল, শ্যামা, বক, চড়ুই আরো ঢের রকম পাখী আমাদের গাছপালার ও শস্যক্ষেত্রের পোকা মাকড় খেয়ে যদি সাবাড় না করতো, তবে আমাদের ফল-ফলারী, শাক-শব্জি কিম্বা অন্য কোন ফসলই রক্ষা পেত না। আর মানুষ কিনা সেই পরম উপকারী বন্ধুদের নির্দ্দয় ভাবে হত্যা করতে একটুও দ্বিধা বোধ করে না।

বোল্‌তা উত্তর দিল,—তোমার কথা শুনে বড়ই খুসী হোলাম। এবার তবে যাই—বোঁ বোঁ বোঁ নমস্কার।

বোলতা সোণালী পাখা দুলিয়ে দূরে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

*　　*　　*

সন্ধ্যাপ্রদীপ হাতে তিনকড়ির মা বারেন্দায় এসে দেখে বারেন্দায় এক কোণে রেলিংএ ভর ক'রে তিনকড়ি ঘুমিয়ে পড়েছে।

মা ডেকে বল্লেন,—কি তিনকড়ি, এমন অবেলায় কখনো ঘুমুতে আছে ?

তিনকড়ি হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠে বল্ল,—মা—আজ একটা ভারি চমৎকার স্বপ্ন দেখেছি। পৃথিবীর সকল কীট, পোকা, পাখীরাই যেন আমার বন্ধু! মাগো, কত উপকারই না তারা আমাদের কচ্ছে! মা, আজ তোমায় ছুয়ে প্রতিজ্ঞা কচ্চি, আমাদের এই উপকারী বন্ধুদের মেরে কখনো পাপ করবো না।

মা উত্তর দিলেন,—আমিও আজ তোমায় আশীর্ব্বাদ কচ্চি, ধর্ম্মে যেন তোমার চিরকাল মতি থাকে।

মেঘমালার দেশে

মেঘমালার দেশে

এক

শিলিগুড়ি থেকেই সেই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি সুরু। কাজলী মেঘের হাল্কা পান্সীগুলিতে কে যেন পাল তুলে দিয়েছে! সাম্নে আকাশ জোড়া কি সুন্দর মেঘের পট! পিছনের মেঘগুলি যেন ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতো বেদম দৌড়ের পাল্লা দিয়ে ছুটেছে! ধাপে ধাপে পাহাড়ের সিঁড়ি বেয়ে মেঘগুলি যেন উপরে চড়েছে! সাদা মেঘের চুণকামে হিমালয়ের মিশ্‌মিশে কালো রং ঢেকে দেবার মতলবে মেঘের তুলি কেবলি বুলিয়ে দিচ্ছে! পাহাড়ের তলায় সবুজ বনের ছায়া ঝাপ্‌সা মেঘে ঘোরালো হয়ে উঠেছে! বনের পাখী ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে বাদল-ঝরা আকাশ পানে সভয়ে তাকিয়ে আছে। আর পাহাড়ের চূড়া ডিঙ্গিয়ে ফুরফুরে মেঘের সারি রাজহাঁসের মত উড়ে চলেছে—দক্ষিণ থেকে বরাবর উত্তরে।

শিলিগুড়িতে দার্জ্জিলিঙের ছোট গাড়ীগুলি দেখে মনে হোল, এই খেলনা গাড়ীগুলি কি, সত্যি মানুষের চড়বার জন্য তৈরী? এক-একটা ছোট এঞ্জিনের সঙ্গে মাত্র ৩।৪ খানা গাড়ী জুড়ে দিয়েছে। এই ভাবে গাড়ী সঙ্গে জুড়ে চারখানা এঞ্জিন আগে-পরে রওনা হোল। কাজেই পাহাড়ের আঁকা বাঁকা পথে সাম্‌নের ও পিছনের সেই গাড়ীগুলির যেন লুকোচুরি খেলা চল্‌তে লাগলো! কখনো দূরে—কখনো বা একটু উপরে বা নীচে গাড়ীগুলির পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ হ'তে লাগ্‌লো; আবার পথের মোড় ঘুরে বনের ভিতর সেগুলি অদৃশ্য হয়ে যেতো।

মাথার উপর দিয়ে মেঘ ছুটে চলেছে। আর আমাদের গাড়ীখানিও অজগরের মত ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দে পাহাড়ের গা বেয়ে সেই মেঘের দেশেই ছুটে চলেছে—ভেবে, ভারি আমোদ হোল। এতদিন এই মেঘগুলি উঁচুতে থেকে কতই না রহস্যের খেলা দেখিয়েছে! কিন্তু আর ঘণ্টা কয়েক বাদেই এই মেঘগুলি নিতান্ত পরিচিতের মত এসে আমাদেরই গা ছুঁয়ে চলে যাবে। এমন কি আমরা যখন একেবারে পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে উঠবো, তখন মেঘগুলি

মেঘগুলি পাহাড়ের গা জড়িয়ে আছে

লজ্জায় পাহাড়ের গা জড়িয়ে ধরে নীচে পড়ে থাক্‌বে—কি মজা !

আমাদের গাড়ী পাহাড়ের গা বেয়ে ক্রমাগত উপরে উঠতে লাগলো। হঠাৎ এক পশ্‌লা বৃষ্টি পাহাড়ের গা ভাসিয়ে দিয়ে চলে গেল। পাহাড়ের চারিদিকে ঝরণার জল প্রবল বেগে গড়িয়ে পড়তে লাগলো। পাহাড়ের বুকে মেঘের প্রতিধ্বনি—ঝরণার জলের তা-থৈ তা-থৈ নৃত্য—যেন স্বয়ং ভোলানাথ শিঙা ফুঁকে অনুচর সঙ্গে নৃত্যে মাতোয়ারা !

খরসান্ পার হয়ে দেখি উপরে আর মেঘ নাই—আকাশ বেশ ফর্সা, কিন্তু পাহাড়ের নীচে এখনো মেঘের গুমোট অন্ধকার।

বেলা দু'টোর সময় দার্জ্জিলিঙে এসে পৌছান গেল। ভুটিয়া আর লেপ্‌চা কুলীর দল ভীমরুলের মত এসে গাড়ীর মালপত্র চারিদিক থেকে ছিঁকে ধরলো। কুলীর রেষারেষী আর গোলমালে যাত্রীদের এমনি বিভ্রাট ঘটলো যে মালপত্র তো দূরের কথা তখন আস্ত শরীরটা নিয়ে বের হওয়াই মুস্কিল! কুলীরা তো যে-যার খুসীমত মালপত্র পিঠে চাপিয়েই দে ছুট! তারপর ষ্টেসনের বাইরে এসে তুমি

লেপচা মেয়ে-কুলী

নিজের মালপত্র খুঁজে বের কর—বায়না রফা কর, তবে গোলমালের শেষ। একটা ছোট্ লেপ্চা মেয়ে মালপত্র না পেয়ে যাত্রীকে অপূর্ব্ব মুখভঙ্গী দেখিয়ে বিদায় হলো!

বাইরে ভুটিয়া রিক্সওয়ালার "বাবু রিস্ক"—এমনি অপূর্ব্ব উচ্চারণ যে রাত্রে শুন্‌লে অনেকের আঁৎকে উঠবার সম্ভাবনা! দার্জ্জিলিঙ্ এসে প্রবাসযাত্রীদের প্রথম কাজ, কাঞ্চনঝজ্ঘার চূড়া দেখা। পৃথিবীতে তেমন দৃশ্য খুবই বিরল। বেশী সময়ই কাঞ্চনঝজ্ঘার চূড়া মেঘে ঢাকা থাকে, কাজেই সেটা দেখ্‌বার আগ্রহও লোকের খুব প্রবল। এই মেঘ আর কুয়াসার দরুণ কাঞ্চনঝজ্ঘা লোকের নিকট যাত্নকরের প্রহেলিকার মতই মনে হয়। কখনো ২০।২৫ দিন ক্রমান্বয়ে কাঞ্চনঝজ্ঘার চূড়া মেঘে ঢেকে আছে, হঠাৎ অল্পকালের জন্য আকাশ পরিষ্কার হয়ে পার্ব্বত্য প্রকৃতির মাঝখানে চূড়াটি অকস্মাৎ ভেসে উঠলো—সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! চারিদিকে যেন তখন সৌন্দর্য্য ঝল্‌মল্ করতে থাকে!

দার্জ্জিলিঙ্ আস্‌বার দিন তুই বাদে একদিন শেষরাত্রিতে সঙ্গীরা সকলে হৈ হৈ শব্দে জেগে উঠলো। বাইরে কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া। একজন যাত্রী বল্লেন,—শীগ্‌গীর বাইরে

ঞ্চন জঙ্ঘা

আসুন, কাঞ্চনঝজ্ঘার চূড়া দেখা যাচ্ছে। আমরা দল বেঁধে বাইরে গেলাম। একদল যাত্রী রাত্রি জেগে পাহারা দিচ্ছিলেন, কাঞ্চনঝজ্ঘার চূড়া দেখা যেতেই তাঁরা সকলকে খবর পাঠিয়েছে। চেয়ে দেখি, নিকষ-কালো আকাশ-বুকে দিগন্ত-প্রসারিত শুভ্র বরফরাজ্য বেশ স্পষ্ট ফুটে বের হয়েছে। কালো আকাশের বুকে সেই জ্যোতিরেখাটী দিগন্তের এক সীমা থেকে অপর সীমা পর্য্যন্ত যেন সৌন্দর্য্যের একটা অপূর্ব্ব মালা রচনা করে রেখেছে!

একটু আলোক অল্পে অল্পে ফুটে উঠতে লাগলো। সেই শুভ্র রেখাটীর পশ্চাতে উষা যেন তার রঙ্‌মশাল জ্বেলে রাত্রির অন্ধকার সরিয়ে দেবার উদ্যোগ করচে! হঠাৎ বরফ শৃঙ্গের চূড়ায় সরু একটা পাত্‌লা সোণালী রেখা জ্বল্ জ্বল্ ক'রে ফুঠে উঠলো,—সাদা কাপড়ে যেন সোণালী পাড়ের জরির চক্‌চকে বুননি! তারপর পাহাড়ের চূড়ার অগ্রভাগ মশালের আগুনের মত জ্বলে উঠ্‌লো! মনে হলো, কাঞ্চন-ঝজ্ঘার চূড়ায় হঠাৎ কে যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে! ক্রমে সেই আগুন পাহাড়ের অন্য শিখরে শিখরে ছড়িয়ে পড়তে লাগ্‌লো। দিনের আগমনী জানিয়ে দেবার জন্যই প্রকৃতিদেবী

দার্জ্জিলিঙের দৃশ্য

যেন এই আলোক-তোরণ পাহাড়ের চূড়ায় জ্বেলে রেখেছে! তারপর ভোরের আলো যতই ফুটে উঠতে লাগলো, বরফ-শৃঙ্গগুলির দৃশ্যও তেমনি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বদ্‌লে যেতে লাগলো। শত্রুর কামানের গোলাতে দূরের কোন যাদুকরের দুর্গের সমস্ত স্থানে যেন আগুন ধরে উঠেছে!—লাল নীল সবুজ কত রঙের আভা তা' থেকে ফুটে বেরুচ্ছে! সেই দুর্গ জয় ক'রে পাহাড়ের আড়াল থেকে সূর্য্য একেবারে চূড়ায় এসে দাঁড়ালো। বরফশৃঙ্গগুলি ভয়েই যেন এক মুহূর্ত্তে সাদা হয়ে উঠলো! হঠাৎ পাহাড়ের নীচের কুয়াসা আর মেঘ এসে সমস্ত ঢেকে ফেলে আমাদের দৃষ্টি রোধ করলো।

এতক্ষণ তন্ময় ছিলাম। চেয়ে দেখি, আশে পাশে বহু লোক কাঞ্চনঝঙ্ঘা দেখ্‌বার জন্য আমার মতো উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে—দেখা যেন এখনো তাদের শেষ হয় নি!

দার্জ্জিলিং

২৪।৬।২১

মেঘমালার দেশে

দুই

দুপুর বেলা কাঞ্চনঝঙ্ঘার চূড়া দু'টি কুয়াসার ভিতর থেকে যমজ ভাইবোনের মত গলাগলি হয়ে হঠাৎ ফুটে বেরুলো—যেন আশ্চর্য্য ভেল্কির মতন! এই ছয় সাত দিন বৃষ্টির অবিরল ধারায় একটা কান্নার সুর কেবলি বেজে উঠেছে! আজ সূর্য্যের আলো ফুটে উঠ্‌তেই আব্‌দার ভাঙ্গানো ছোট্ট শিশুর কান্না-মাখা মুখে হাসির ঝলক্ যেমন দ্বিগুণ হ'য়ে উঠে, তেমনি একটা আনন্দের সাড়া চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো! পাইন গাছের পাতায় পাতায় মুক্তা-ঝরা বিন্দু, গাছপালার চমক লাগা আভা, পাথরকুচির ঝিক্‌মিকে রূপ, চারিদিকে যেন গলে পড়তে লাগলো! আমাদের কাচ-মোড়া ঘরের দরজা জানালায় বৃষ্টির ছাট্ জমেছিল, এক মুহূর্ত্তে সেগুলি আলোর-আবিরে রঙিণ হয়ে উঠ্‌ল। দূরে ধব্‌ধবে সাদা বরফের চূড়ায় সূর্য্যকিরণ যেন প্রতি মুহূর্ত্তে রং বদ্‌লাতে সুরু করলো;—কখনো লাল টুক্‌টুকে, কখনো

সোণার মতন জ্বলজ্বলে, কখনো সাতরঙী রূপের নানা রকম অদল বদল হচ্ছে! নাটকের পটের মতন আস্তে আস্তে কুয়াসা সরে যেতেই বরফশ্রেণী ক্রমে বিস্তৃত হয়ে হিমালয়ের বিরাট রূপ ফুটে বেরুলো। শিবের জটা থেকে ফেনিয়ে-পড়া গঙ্গার মত বরফ শৃঙ্গের তুষারগুলি সূর্য্যকিরণে গলে প্রপাতের মত নীচে গড়িয়ে পড়তে লাগ্‌লো!

আমরা সচরাচর মেঘ দেখি, উপরের দিকে চেয়ে; কিন্তু এখানে মেঘগুলি নীচু থেকে থামের মত উচু হয়ে উপরের দিকে ছুটে আস্‌ছে। পাগলা হাতীর শুঁড় থেকে জল যেমন উচুতে ছড়িয়ে পড়ে—মেঘগুলিও ঠিক তেম্‌নি পাহাড়ের চূড়ায় এসে ছড়িয়ে পড়তে লাগ্‌লো! আর সেই ছিন্ন-মেঘেরদল সেখানে জড় হয়ে উত্তাল সমুদ্রের মতন তরঙ্গায়িত হয়ে উঠ্‌লো! ক্রমে সেই মেঘখণ্ডগুলি বিস্তৃত হয়ে বিরাট মেঘ-সমুদ্রে পরিণত হলো। সেকি চমৎকার রূপ!—পাহাড়ের চূড়ায় সমুদ্রের আশ্চর্য্য শোভা! যতদূর দেখা যায়, মনে হয়—সমুদ্র যেন সফেন তরঙ্গভঙ্গে দুলে উঠ্‌চে! সূর্য্য তার ভিতর দিয়ে আস্তে আস্তে ডুবে পড়লো। মনে হলো—সত্যি যেন আমরা সাগরে সূর্য্যাস্ত-শোভা দেখ্‌লাম!

উত্তাল সমুদ্রের মতন

দূরে পাহাড়ের ঢালু জায়গায় ভুটিয়াপল্লির সারি সারি ঘরগুলি কি চমৎকার মনে হয়। তার পাশে স্থানে স্থানে মেঘগুলি স্তূপাকার হয়ে রয়েছে। কাঞ্চনঝঙ্ঘার পাশে আরো কতগুলি বরফশৃঙ্গ আছে, সেগুলি কাঞ্চনঝঙ্ঘার চেয়ে আকারে কিছু ছোট।

সেদিন বিকালবেলা জুর্জ্জয়লিঙ্গ পাহাড়ে বেড়াতে গেলাম। তার চূড়ায় উঠে দেখি, সূর্য্য মেঘের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছে।

সন্ধ্যা মলিন হয়ে উঠ্‌বার সঙ্গে সঙ্গেই মস্‌লিনী পরদার মত সূক্ষ্ম কুয়াসাকণায় চারিদিকের পাহাড়শ্রেণী আস্তে আস্তে ঢেকে পড়লো। পাহাড়ের মাঝখানে কেবল আমরাই দাঁড়িয়ে আছি—আর কিছুই নাই, সমস্তই যেন বিলুপ্ত হয়েছে!

পাহাড় থেকে নেবে 'মলের' একটা বেঞ্চের উপর আমরা বসে পড়লাম। সেখানে সান্ধ্য-ভ্রমণে আগত বহু বালক-বালিকা ও পৌড় স্ত্রীপুরুষ জড় হয়েছে। ভুটিয়া রিক্সওয়ালার দল যাত্রী খুঁজে বেড়াচ্ছে। একদল ভুটিয়াবালক ঘোড়া ভাড়া দেবার উদ্দেশ্যে আরোহীর খোঁজ কচ্ছে; আরোহীকে ঘোড়ায় চড়িয়ে ওরা ঘোড়ার লেজ ধরে ঝুলে থাকে। পাহাড়ের দুর্গম 'চড়াই' 'উৎরাই' রাস্তায় অক্লেশে ওরা ঘোড়া চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

গরম জামা-কাপড়ে সর্ব্বাঙ্গ মুড়ে দার্জ্জিলিঙবাসী সাহেব ও বাঙ্গালীবাবুরদল 'মলের' সারি সারি বেঞ্চিগুলিতে বসে গল্পগুজব ও কথাবার্ত্তায় হাসির ফোয়ারা খুলে দিয়েছে।

মলের এক পাশে 'ক্যালকাটা রোড্'। সেই পথে ৪।৫ মাইল দূরে 'ঘুম' ষ্টেসন। অধিকাংশ যাত্রীই 'মল' থেকে বের হয়ে 'অব্জারভেটরী' পাহাড় প্রদক্ষিণ

ক'রে 'মলে' ফিরে আসে। সেই রাস্তায় কাঞ্চনঝঙ্ঘা-চূড়া দেখ্‌বার জন্য কিছুদূরে একটা বস্‌বার জায়গা আছে। বিকালবেলা অনেকে এই বেঞ্চখানা দখল করবার জন্য তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়ে পৌঁছায়। দার্জ্জিলিঙের প্রধান বিশেষত্ব, এখানকার মেঘ-রৌদ্রের খেলা। এই স্নুন্দর পরিষ্কার দিন—একটুবাদেই সমস্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। কখন যে মেঘ এসে পড়বে কিছু ঠিক নেই। বর্ষাকালে দার্জ্জিলিঙে মেঘ-রৌদ্রের এই লুকোচুরি খেলা দেখ্‌তে ভারি মজা।

এখানকার দ্বিতীয় বিশেষত্ব, দার্জ্জিলিঙের কুয়াসা। পরিষ্কার দিনে ও বৃষ্টির একটু পরে, কিংবা প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যায় প্রায় সকল সময় এই কুয়াসার অবিরাম খেলা। পথে চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ এমনি কুয়াসার মাঝখানে পড়তে হয় যে এক হাত দূরের জিনিষও নজরে পড়ে না। তবে কুয়াসার একটা মস্ত বড় গুণ—ওতে 'ওজন' নামক একটি বাষ্পীয় পদার্থ আছে, সেটি স্বাস্থ্যের পক্ষে পরম উপকারী। পাহাড়ে পথচলার সময় শরীর সহজেই ক্লান্ত ও অবসন্ন হয় ; তখন এই 'ওজন' মিশ্রিত বায়ুতে শরীর বেশ তাড়াতাড়ি

জোরালো হয়ে উঠে;—কুয়াসার দরুণ বেশী পরিশ্রমেও অধিকক্ষণ হাঁপাতে হয় না।

পরদিন মলের বা'দিকের রাস্তায় সোজা 'বার্চ্চ হিলের' দিকে বেড়াতে গেলাম। রাস্তায় দুই পাশে ঘন পাইন-বন। নির্জ্জন আঁকা-বাঁকা পথে আমি 'বার্চ্চ হিলের' চূড়ায় গিয়ে উঠলাম। চূড়ার উপর কয়েক খণ্ড বিরাট শিলাস্তূপ। সেই প্রস্তরখণ্ডের উপর বসে উত্তরদিকে চেয়ে দেখি, কাঞ্চন-ঝঙ্ঘার চূড়া অস্তগামী সূর্য্যকিরণে আধখানা রঞ্জিত হয়ে উঠেছে,—সেই গোলাপী টুক্‌টুকে আভাটি কি মনোরম! কুয়াসায় সেই আভাটুকু আস্তে আস্তে ঢেকে পড়লো। দক্ষিণে দার্জ্জিলিং সহরের দিকে চেয়ে দেখি—পাহাড়ের ঢালু দিকে স্তরে স্তরে সারি সারি অট্টালিকাশ্রেণী; উপরে পাইনের বনের সবুজ শোভা। গোটা পাহাড়টির দিকে চেয়ে মনে হোল আমার, সবুজ প্রকাণ্ড বাঁকা ধনুকখানিতে কেউ তীর ছোড়্‌বার উদ্যোগ করছে। লম্বা পাইন আর 'ত্রিপ্‌টোমেরিয়ার' সারি সারি গাছগুলি ঠিক তীরের মতই উঁচু হয়ে রয়েছে। দার্জ্জিলিঙ্‌পাহাড়টির আকার ঠিক ধনুকের মতন বাঁকা। উপরে জলাপাহাড় ও কাঁটা পাহাড়।

জলাপাহাড়ের মাথায় গির্জ্জার চূড়ার সরু দিকটা যেন আকাশ ফুঁড়ে উঠেছে! তারই নীচে ধাপে ধাপে পাহাড়ের গায় সুন্দর অট্টালিকাশ্রেণী,—ইহাই দার্জ্জিলিঙ্ সহর।

সেখান থেকে চারিদিকে তাকালে সীমাহীন পাহাড়ের শ্রেণী চোখে পড়ে। বহুদূরে তিব্বত ভুটান ও নেপালের সীমানা দেখা যায়। তিব্বতপথের 'কালিম্পং' সহরের ঘরবাড়ীগুলি এখান থেকে স্পষ্ট নজরে পড়ে। 'অব্জারভে-টরি' পাহাড়ের চূড়ায় একজন তিব্বতীয় লামা ও একজন ব্রাহ্মণ সেবাইৎ আছে।

তিব্বতীয় লামা জপ-চক্র ঘুরিয়ে সুর ক'রে মন্ত্র পাঠ করে; আর ব্রাহ্মণ-সেবাইৎ একটি পাথরে সিঁদূর লেপে, কালীমায়ের ফুলবেলপাতার আশীর্ব্বাদী বিলিয়ে বেশ দু'পয়সা রোজগার করে। ব্রাহ্মণ-সেবাইৎটি নেপালবাসী বাঙ্গালী—বেশ পণ্ডিত ব্যক্তি।

সে দিন দুর্জ্জয়লিঙ্গ পাহাড়ে ভুটিয়াদের একটা বড় রকমের উৎসব ছিল। ভুটিয়া স্ত্রীপুরুষ, ছেলেমেয়ে নানা বেশভূষায় সেজে মন্দিরের চারিদিকে দলে দলে গানের

তালে তালে নাচ্‌তে লাগলো। তারপর মন্ত্রলেখা রঙীন কাপড় ঝুলিয়ে দিল। পূজা শেষ হ'লে ভুটিয়ারা পরস্পরকে পানীয় দিয়ে অভ্যর্থনা করলো। সে ভারি সুন্দর দৃশ্য! পাহাড় থেকে নেবে আসবার সময় দেখি একদল মেয়ে রাস্তা মেরামতের জন্য "রোলার" ধরে টান্‌ছে, আর সবাই মিলে ভারি মিঠা সুরে গান গাইছে। আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে সে গান শোন্‌লাম, এবং আস্‌বার বেলা কিছু বক্‌সিস সর্দ্দারের হাতে গুঁজে দিয়ে এলাম।

তাহাদের একটা সরল হাসির উচ্ছ্বাস অতিদূরেও আমাদের কানে এসে পৌঁছ্‌লো।

মেঘমালার দেশে

সিঞ্চলে এক রাত্রি

বেলা দু'টোর সময় আমরা সিঞ্চল পাহাড়ে যাত্রা করলাম। দার্জ্জিলিঙ থেকে সিঞ্চল বেশী দূরের পথও নয়,—সাপ-চলার মত আঁকা বাঁকা পাহাড়ী রাস্তায় মাইল ছয় কি সাত। ছপ্‌ছপে নীলগোলা পাহাড়ের রেখা বিরাট গহ্বরের তল থেকে সোজা উঁচু হয়ে যেন আকাশ আগ্‌লে রেখেছে! সাদা সাদা মেঘ, পরীর মতন দলে দলে উড়ে এসে এই পাহাড়ের গলা জড়িয়ে ধরে! তারি পাশে 'টাইগার হিলের' চূড়া অঁাজল-করা দুই হাতের মতন মাথার উপর উঁচু হয়ে উঠেছে! সাদা মেঘের সারি সেই চূড়ায় বিঁধে দু' ফাঁক হয়ে ছড়িয়ে পড়ে! মনে হয়, হাজারো যুঁই ফুলের মালা কে যেন দু'হাতে আকাশ পথে ছড়িয়ে চলেছে। কি চমৎকার দৃশ্য! পাহাড়টির উচ্চতা প্রায় ৯ হাজার ফিট।

দার্জ্জিলিঙের ছোট ছোট রেলগাড়ী পাহাড়ের কোল ঘেঁসে সাপের মতন এঁকে-বেঁকে রওনা হলো। লাইনের

উপর থেকে গাড়ী পিছ্‌লে গড়িয়ে না পড়ে সেজন্য দু'জন লোক এঞ্জিনের সাম্‌নে বসে ঝাঁপি থেকে লাইনের উপর ক্রমাগত কুঁচোবালি ছড়িয়ে দিচ্ছিল। ছবির মতন দার্জ্জিলিঙের সুন্দর সহরটি পাহাড়ের আড়ালে ঢেকে পড়লো। গাড়ী 'ঘুম' ষ্টেশনে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই এঞ্জিনের পরের গাড়ীখানা এঞ্জিন থেকে খসে 'লাইনের' উপর উল্টে পড়লো। রাস্তায় আর কোথাও এই বিপদ ঘট্‌লে বাকি গাড়ীগুলির আর যাত্রীদের যে কি দুরবস্থা হ'তো—তা' আর ভেবে কাজ নেই। আমরা ধাক্কা খেয়েও তাল্‌-সামলে নিশ্চিন্ত হয়ে গাড়ীতেই বসে রইলাম। বাইরে তখন একটা মস্ত হৈ চৈ ব্যাপার। শ্বেতাঙ্গ মহিলারা ভয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে গাড়ী থেকে নেবে পড়লেন। সকলেই 'তার' ঘরের দরজায় গিয়ে বন্ধুবান্ধবদের কাছে নিজেদের পুনর্জ্জীবন লাভের খবরটা জরুরী তারে পাঠাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ;—'ভয়ানক ট্রেন দুর্ঘটনা ; জীবন রক্ষা পেয়েছে, শারীরিক কিছুই অনিষ্ট হয় নাই।' এক গাদা খবর 'তার' বাবুর টেবিলের উপর জড় হলো।

'ফরেষ্ট' আফিসের জিম্মায় আমরা বিছানাপত্রগুলি রেখে

সিঞ্চলে রওনা হলাম। 'ফরেষ্ট' অফিসের সাম্‌নের রেল লাইন পার হ'তে গিয়ে দেখি, শিলিগুড়ির গাড়ী নীচের দিকের বনের সুরঙ্গরাস্তা দিয়ে হুস্ হুস্ শব্দে অজগরের মত উপরে উঠে আস্‌চে। হঠাৎ গাড়ীখানা চলে যাবার সময় গাড়ীর জানালায় হাত গলিয়ে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় আমায় ইসারা ক'রে তাঁর দার্জ্জিলিঙ্ আস্‌বার খবরটা জানিয়ে গেলেন। আমরা তাঁর জন্য সেখানে খানিক অপেক্ষা করলাম; ভাব্‌লাম, যদি এসে পড়েন, সিঞ্চলযাত্রাটা আমাদের ভারি সুখের হবে;—তিনি এলেন না। পরে শোন্‌লাম, আমরা সিঞ্চল চলেছি খবর পেলে নিশ্চয়ই তিনি আমাদের সঙ্গে এসে মিলিত হতেন। "বেলাক্লেভা" হোটেলে আমরা তিনজনেই জোট ক'রে রাতের চায়ের সঙ্গে পুরোপুরি আহারটাও সম্পন্ন ক'রে নিলাম।

আমরা আস্তে আস্তে পাহাড় চড়তে সুরু করলাম। সিঞ্চলের পথের দৃশ্যটি ভারি চমৎকার! কালো পাহাড়ের বুক জুড়ে একটা সবুজশ্রী কুয়াসার ওড়নায় ঢেকে লাজুক বধূটির মত চুপ ক'রে রয়েছে! সেখানে গাছপালায় ঋষি-মুনির দীর্ঘশ্মশ্রুর মতন একরকম পরগাছা ঝুল্‌ছে। দেখে

মনে হয়, গাছগুলি যেন বনের সত্যিকার তপস্বীর দল! এতক্ষণ গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়্ছিল; এইবার জোরে এক পশ্‌লা বৃষ্টি এলো; কাজেই আমাদের গায়ের জামা জুতো মোজা ভিজে তুজ্‌বুজে হলো।

সিঞ্চলের ডাকবাঙ্গলার কাছে এসেই আমাদের সঙ্গের 'গাইড' বিদায় হলো। সন্ধ্যার পর এই রাস্তায় নাকি বাঘ চলাচল করে; কাজেই লোকটি তাড়াতাড়ি ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ের খাড়া 'উৎরাই' ধরে নেবে গেল।

সন্ধ্যার আর বিলম্ব নেই। কাচা-রক্তের মত টস্‌টসে আভা আকাশ বেয়ে পাহাড়ের বরফ-ঢাকা চূড়ায় গড়িয়ে পড়চে! পাহাড়ের চূড়ায় সূর্য্যাস্ত দেখ্‌বার লোভটা আমাদের সকলেরই প্রবল হয়ে উঠলো।

রাস্তার একদিকে পাইনের ঘন জঙ্গল; সেই বনের মাথায় পাইনের পাতায় পাতায় ঠেসাঠেসি হয়ে যেন সবুজ বিছানা পেতে রেখেছে! গাছের তলায় এমন চোখ-বোজা অন্ধকার যে দিনের বেলাও সেখানে কিছু দেখা যায় না।

আমাদের 'গাইড' বিদায়ের সময় ব'লে গেছিল, 'টাইগার' পাহাড়ে সময় সময় বনমানুষের বড় উৎপাত ঘটে;

কাজেই এই অবেলায় সেখানে যাওয়া কিছুতেই নিরাপদ নয়,—তারা মানুষ দেখ্‌লেই তেড়ে কাম্‌ড়াতে আসে।

এই কথায় আমার সহযাত্রীগণের মনে একটু চাঞ্চল্য ঘটলো ;—কিন্তু আমি ফিরে যেতে একেবারেই নারাজ। আমার কথায় পরে শেষটায় তাঁরাও রাজী হলেন।

পাহাড়ে কিছুদূর উঠেই দেখি, সুদূর পাহাড়ের পাশ দিয়ে আরক্ত গোলক নীচে গড়িয়ে পড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে যাদুকরীর সোনার মহল যেন ভেঙ্গে মিলিয়ে যেতে লাগ্‌লো! পৃথিবীর এই মনোহর রূপটিকে ঢেকে দেবার মতলবে সন্ধ্যা যেন এতক্ষণ কালীর রং গুলে প্রতীক্ষা কচ্ছিল। এইবার সুযোগ বুঝে পৃথিবীর সারা গায় কালী ছড়িয়ে দিল!

গাছপালায় ঢাকা পাহাড়ের অন্ধকার পথে তাড়াতাড়ি চল্‌তে গিয়ে আমাদের সাহসের মাত্রাও ক্রমে লঘু হয়ে আস্‌ছিল ; কিন্তু এতদূরে এসে তো আর ফেরা যায় না ; কাজেই আমরা তাড়াতাড়ি পাহাড়ের চূড়ায় উঠ্‌তে লাগ্‌লাম।

যখন পাহাড়ের চূড়ায় এসে পৌচেছি, তখন নিবিড়

অন্ধকার চারিদিক ঘিরে ফেলেছে, মাথার উপর তারাগুলির ঝিক্‌মিকে খেলা সুরু হয়েছে। সেখানে আর বেশীক্ষণ দেরী করা গেল না। তাড়াতাড়ি পাহাড়ের গা বেয়ে আমরা নীচে নেবে এলাম। সেই অন্ধকার-ঘেরা বনের পাশ দিয়ে আমাদের ফিরতে হলো। বাঘের সঙ্গে আমাদের যে দেখা হয় নি'—সেটা কতকটা কপাল জোর।

গাছপালাগুলি কালো পাহাড়ের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেল। মাথার উপর তারার আলো আর রাত্রির কন্‌কনে ঠাণ্ডা—একটা জমাট-বাঁধা আবেশ যেন সৃষ্টি ক'রে তুলেছে!

ডাকবাঙ্গলায় ফিরে এসে দেখি, আমাদের বিছানাপত্রগুলি এখনো এসে পৌঁছায় নি'।

আমাদের জামাকাপড়গুলি ভিজে ভুজ্‌বুজে হয়েছে, কাজেই আরো বেশী শীত বোধ হতে লাগলো;—কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া শরীরে যেন ছুঁচ ফুটাতে সুরু করলো।

ডাকবাঙ্গলার নিকটে একটা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে—চারিদিকে প্রকৃতির ঘন মসিময় ছবি আমাদের নজরে পড়লো। বহুদূরে দিওয়ালীর বাতির মতন দার্জ্জিলিঙ সহরের সারি সারি বাতিগুলি ঝিক্‌মিক্‌ কচ্ছে। হঠাৎ

নীচে তাকিয়ে দেখি, আমরা যে পাহাড়ের চূড়ায় নিশ্চিন্তে বসে আছি, সেটা একটা বিলয়ী-পাহাড়ের চূড়া। তাড়াতাড়ি পাহাড় থেকে আমরা নীচে নেবে এলাম। কখন যে সমস্ত পাহাড়টি গাছপালাসহ হঠাৎ ধ্বসে পড়বে ঠিক কি !

রাত বেশী হতেই ভাবনা হোল, আজকের এই ভয়ানক শীতের রাত্রিটা কি ভাবে আমাদের কাটবে ? এখানকার শীত দার্জ্জিলিঙের চেয়ে ঢের বেশী।

ডাকবাঙ্গলার জমাদার ঘরের চুল্লিতে অনেক কাঠ দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল। চুল্লির আগুন দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠলো। ঘরের দরজা জানালা ও শার্শীগুলি আমরা ভাল ক'রে বন্ধ ক'রে দিলাম। আগুনের তাপে অল্পক্ষণেই ঘর বেশ গরম হয়ে উঠলো।

গায়ের ভিজা জামাকাপড়গুলি খুলে আগুনের ধারে শুকাতে দিলাম। জুতোগুলি চুল্লির একপাশে রাখ্‌লাম। একজনের জুতায় চুল্লির আগুন ধরে একটা বোঁট্‌কা গন্ধ বেরুলো। কি জ্বালা !

ভাব্‌লাম, আজকের এই রাতটা উনুনের ধারে বসেই

কাটাতে হবে। তা' বরং এক কাজ করা যাক; সারা রাত্রি জেগে বই পড়া মন্দ কি? আমাদের সঙ্গে 'ডষ্টেয়েভ্স্কীর' একখানা বই ছিল। আগুনের চিমনির ধারে চেয়ার টেনে এনে পালা বদল ক'রে আমাদের বইপড়া সুরু হলো। মনে হলো, আদিমকালের সেই মানুষের কথা। তখন লোকেরা বাতির বদলে প্রকাণ্ড ধুনি জ্বেলে রাত্রিবেলা ঘরের কাজকর্ম্ম সম্পন্ন করতো, এবং আগুনের তাপে খালি গায়ে শীতের হাত থেকে রক্ষা পেত। আমরাও যেন কোন গুহার ভিতর সেই রকম অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে সেকালের সত্যিকার অভিনয় ক'রে যাচ্ছি! আগুন জ্বালিয়ে রাখবার জন্য বার বার চুল্লির কাঠগুলি আমাদের উস্কিয়ে দিতে হচ্ছে।

চিমনীর গরমে আমাদের জামা কাপড়গুলি শুকিয়ে উঠলো। সেই জামা কাপড় পুনরায় গায় জড়িয়ে আমরা বাইরে বেড়াতে গেলাম।

কালো রাত্রির কি চমৎকার রূপ! চারিদিক নিস্তব্ধ। ঘনকৃষ্ণ পর্ব্বতমালার উপর জ্যোৎস্নার ঈষৎ আলো যেন একটা অস্পষ্ট ভীতির মত জেগে রয়েছে। মাথার উপর নক্ষত্র-দ্যুতিভরা বিশাল আকাশ—কত যুগের পরিচয় নিয়ে

জেগে রয়েছে! সেই গভীরতার ভিতর কত লক্ষ কোটি জগৎ নিস্তব্ধতায় নিমগ্ন!

কোন্ এক মহারহস্যের মধ্যে সৃষ্টির এই অনির্ব্বচনীয়তা ফুটে উঠেছে কে জানে! বৃক্ষপত্রে, বনের মর্ম্মর-বাঁশীতে আলো-ছায়ার চাঞ্চল্যের মধ্যেও সেই অনির্ব্বচনীয়তার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে!

জীবনের অপূর্ণতার ভিতর তৃপ্তির একটা পরম-পরশ নিঃশব্দে ভরে উঠলো! রূপ ও সাধনাকে পশ্চাতে ফেলে একটা অতীন্দ্রিয় আবেশের মধ্যে জীবন-বিন্দু ক্ষণেকের জন্য মিলিয়ে গেল! জীবনের রূপ যেন একমুহূর্ত্তে বদ্‌লে গেল —পুরাতন জীর্ণ আশা ভেঙ্গে চুরমার হলো। অনন্তের সঙ্গে প্রাণের পরিচয় যে কি মধুর—আজ তার কতকটা পরিচয় পেলুম!

জীবনের এই মুহূর্ত্তের উপলব্ধি চিরকাল থাক্‌বে না; হয়তো জীবনের এই স্বচ্ছ ছবি সংসারের নির্ম্মম আঘাতে একদিন বিচূর্ণ হবে,—কিন্তু তার একদিনের সুখ—একদিনের আশা, জীবনে কখনো ভুলতে পারবো না। জীবনে এমন কত মুহূর্ত্ত আসে, যা' বাঁচিয়ে রাখ্‌লে মানুষ অমরত্বলাভে সমর্থ হয়।

মানবের এত কালের সংস্কার কি ভাবে যে এক মুহূর্ত্তে বদ্‌লে যায়—নূতন অনুভূতি জীবনের কানায় কানায় হয়ে উঠে, সেতো জীবনে আমি আরো বহুবার পেয়েছি।

জীবনে আর একদিন এমনি এক মুহূর্ত্ত পেয়েছিলাম; সে শুধু মুহূর্ত্ত নয়,—বহুদিন সেই ভাব আমার চিন্তাতরঙ্গে বিরাজিত থেকে প্রেমের বন্যায় আকাশ ভরে দিয়েছিল। বাস্তব জগতে এই অনুভূতির মূল্য কতখানি খাঁটি জানিনা,—কিন্তু যে-তৃপ্তির আস্বাদ জীবনে আমি লাভ করিছি, তা' বহুযুগলব্ধ তপস্যার ফল। সেই সময় আমি বিশ্বচরাচরে সর্ব্বত্র একটা অচিন্ত্য-প্রেমের মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করতাম:—বৃক্ষপত্রে, পর্ব্বতে, নদী-সলিলে, প্রত্যেক সৃষ্টপ্রাণীর মুখ-মণ্ডলে যেন প্রেমের রাজ্য ছড়িয়ে রয়েছে! যেদিকে চাই, সেইদিকেই আনন্দলীলা ও তার নব নব রূপের বিচিত্র সৃষ্টি! জগতের প্রত্যেক জিনিষটি যেন প্রেমের সৌষ্ঠবে ভরা! আকাশে-বাতাসে, অরণ্যে-পর্ব্বতে প্রেমের মোহন বার্ত্তা—নিঃশ্বাসের মত প্রতিমুহূর্ত্তে বয়ে যাচ্ছে! শিশুর সুন্দর মুখে, বৃদ্ধের বিশুষ্কজীর্ণদেহে সমভাবে সেই প্রেমের

স্রোত উছ্‌লে পড়চে। যেন আনন্দলীলার জন্যই একমাত্র জগতের সৃষ্টি।

একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস বহুদিন পরে প্রাণ থেকে বেরুয়ে এল। গিরিবন ও বহুদূরবিস্তৃত পর্ব্বতমালার তরঙ্গায়িত দৃশ্য যেন কোন্ অপূর্ব্ব রহস্যের জাল বুনে রেখেছে! নক্ষত্রালোকমিশ্রিত আকাশতলে পাহাড়ের নির্জ্জন চূড়ায় বসে একটা সুগভীর শান্তির হিল্লোল আমার সমগ্র দেহমনে উপলব্ধি করলাম।

একটা কৃষ্ণকায় প্রাণী এতক্ষণ আমাদের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল; হঠাৎ সেদিকে আমাদের দৃষ্টি গেল। সেই প্রাণীটি এতক্ষণ পর গা ঝাড়া দিয়ে বার বার পিছন ফিরে আমাদের দিকে তাকিয়ে বনের দিকে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে চা তৈরী হ'লে ডাকবাঙ্গলার জমাদার আমাদিগকে খুঁজতে সেখানে এসে জিজ্ঞাসা করলো,—বাবুরা কি এতক্ষণ এখানেই ছিলেন? আমরা বল্লুম,—হ্যাঁ।

জমাদার বল্লে,—কিছুক্ষণ আগে এই দিক দিয়ে একটা বাঘ চলে যেতে দেখেছেন কি?

আমরা বল্লুম,—বাঘ!—বল কিহে? তা' তো আমরা টের

পাই নি'; তবে খানিক আগে একটা প্রাণী আমাদের পাশেই এসে দাঁড়িয়েছিল।

জমাদার বল্লে,—বলেন কি? সে তো বাঘ! বাঘটি যে আপনাদের সকলকে এতক্ষণ নিকেশ করে নি'—এই ঢের। এই রাস্তায় বাঘটা রোজ যাতায়াত করে; তাই সেই সময়টা আমরা ঘরের আগল বন্ধ ক'রে রাখি। আপনাদের সাহসের বলিহারী!

আমাদের সাহস ততটা মোটেই ছিল না,—বরং তার কথা শুনে বাঘের ভয়টা পরেই যেন বেশী হয়ে উঠলো; তাড়াতাড়ি ঘরে এসে দরজা বন্ধ করলাম! তারপর সারারাত্রি একলা বারেন্দায় আসতেও ভয়ে বুক দুরদুর করতো।

এদিকে অনেক রাত্রিতে 'ঘুম' থেকে আমাদের বিছানা-পত্রগুলি এসে পড়লো। জলঝড়ে বিছানাপত্র ভিজ্‌বে এই ভয়েই লোকটি এতক্ষণ আসে নি'; তারপর আরো কয়েক-জন সঙ্গী জুটিয়ে চলে এসেছে।

এত রাত্রিতে বিছানাপত্রগুলি পেয়ে আমাদের আনন্দ হোল খুব। এইবার চিম্‌নির ধারে নিশ্চিন্তে বসে আবার

গল্প-গুজব সুরু হলো। তারপর তিনজনেই বারেন্দায় গিয়ে চুপ ক'রে বসে রইলাম।

অতি অল্প সময়ই আমরা বিছানায় শুয়েছিলাম। শেষ রাত্রিতে উঠে 'টাইগার হিলে' যাবার উদ্যোগ করলাম। খুব ভোরে 'টাইগার' পাহাড়ের চূড়ায় উঠেই গৌরীশঙ্কর বা "এভারেষ্ট" পর্ব্বতের চূড়া আমাদের নজরে পড়লো। পরিষ্কার আকাশ। কালো পর্ব্বতরেখার মাথার উপর বিস্তীর্ণ বরফাবৃত শৃঙ্গগুলি রূপালি মালার মত ঝক্‌ঝক্ কচ্ছে: তারি মাঝখানে গৌরীশঙ্করের সর্ব্বোচ্চ চূড়াটির শোভা কি মনোরম! একদিকে পাহাড়ের আড়াল থেকে সোণালী আভা সাদা বরফ শৃঙ্গের উপর ঝরণার মত ছড়িয়ে পড়তে লাগ্‌লো! পাইন বনের ফাঁকে সূর্য্যের আভা রাজার সোণার সিংহাসনের মত ঝক্ মক্ ক'রে উঠলো! সরু একটি লাল রেখা আস্তে আস্তে বড় হয়ে একটি রক্ত-গোলকে পরিণত হলো। গিরি-প্রকৃতির মাঝখানে হঠাৎ একটা আনন্দের সাড়া পড়ে গেল;—বনে বনে পাখীর উচ্ছ্বসিত আনন্দ যেন মুহূর্ত্তে চঞ্চল হয়ে উঠলো! হঠাৎ কুয়াসা, আর মেঘে চারিদিক ভরে উঠলো,—কিছুই আর দেখা গেল না।

আলোর পাহাড়

আমরা ডাক্‌বাঙলায় ফিরে এসে চা-পান শেষ কর্‌লাম ; তারপর পাহাড়ের গা বেয়ে সিঞ্চল-হ্রদের দিকে নেবে এলাম। এখান থেকে পাহাড়টি মস্ত বড় একটা সবুজ প্রাচীরের মত দেখায়। এই হ্রদ থেকেই দার্জ্জিলিঙ সহরে জলসরবরাহ হয়।

পাহাড়ের একটা অনির্ব্বচনীয় মোহ এতক্ষণ আমাদের সমস্ত প্রাণ আঁকড়ে ধরেছিল। ধীরে ধীরে আমরা পাহাড় থেকে 'ঘুমে' নেবে গাড়ীতে দার্জ্জিলিঙ ফিরে এলাম।

জন-কোলাহল-মুখরিত দার্জ্জিলিঙের পথে সেই মোহ কখন যে মন থেকে মুছে গেল জানি না।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন প্রণীত

অন্যান্য বই

পুষ্প মঞ্জরী	(ছোট গল্পের বই)	১৲
দীপালা	(ভারতীয় নারী-মহিমার কাহিনী)	১।০
ছেলেচুরি	(কিশোরদের উপন্যাস)	৸০
কালু সর্দ্দার	,, ,,	৸০
মজার গল্প		॥০
ডিগবাজী খাঁ	(মজার 'অ্যাডভেঞ্চার')	৸০
আরোমজা	(রসালো গল্পের বই)	॥৵০
সুন্দর বন		॥০
উড়ো জাহাজ		॥৵০
সাগর রহস্য		॥৵০
অচিন দেশের রাজপুরী	(শিশু উপন্যাস)	।৵০
জলপরী	,, ,,	॥০
জন্মদিন		(যন্ত্রস্থ)
সোণার মুকুল	(শিশু নাটিকা)	,,
অনূঢ়া	(ছোট গল্পের বই)	,,